

কলাম্পাস লিটারেচার

সাসিক অনলাইন সাহিত্য সাময়িকী

বর্ষ ০১ | সংখ্যা ০৬ | নভেম্বর ২০২০



କାନ୍ତପାଦକେର ବାର୍ତ୍ତା

କାନ୍ତପାଦକେ ବିଶେଷମା କରା ହସ୍ତ କଥାଚିତ୍ରେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ହିଲେବେ । ବିଷ୍ଟ କେବେ କାନ୍ତପାଦକେ ସମ୍ମାନ ଆନ୍ତରିଯାଭାବେ ହଣ୍ଡା କରା ହସ୍ତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଥିବୀର କାହାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟାଧିକାରକେ ଧୂଳିଜୀବ କରା ହସ୍ତ । ସୁରାପୁଣି ଦେଖାଣୋ ହସ୍ତ ଆନ୍ତରିଯା ଶାକଜାକେ । ୧୯୭୫ ମାର୍ଚ୍ଚିଆର ମଧ୍ୟରେ ମାନ୍ୟାଧିକାରକେ ଧୈରାନ୍ତି ଏକାଟି ମାତ୍ର ଛିଲ । ତଥା ବେଳୀଯି କାନ୍ତପାଦକେ ବିପଥଗାୟୀ ମେଳାଦେଇ ତ୍ରାପ କରାଇଲେ ଅର୍ଥାତିକାରେ ଶାହଦାଟ ବରାବରାରୀ ବାଂଜାଦେଇର ଜୁଣୀଯି ଦରା ନେଟି କୈଯଦ ଗଜକୁଳ ଦୈନିକୀୟ, ଡାଙ୍କୁଣ୍ଡିନୀମ ଆହ୍ୟଦ, ଏଥ ଯନ୍ମୁଖ ପାଳି ଓ ଏଥିଚିତ୍ରମ କାହାମଞ୍ଜମାନେ ପ୍ରତିର ପ୍ରତି ପ୍ରକା ଜୁଣିଯେ ଆଯାଦେଇ ଏହି କଂଥ୍ଯାର ମାଧ୍ୟକାରୀ କରା ହେଲେ ‘ଜେଳ ହଣ୍ଡା କଂଥ୍ଯା’ । ତଥେ ଏ କଂଥ୍ଯାର ଆମ୍ବାତିକ କାହୁରେ ଆନ୍ତରିକ ବିଷ୍ଣୁ ମାରୀ ନିଳୀଭୂମ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟା-ଆମ୍ରାଯାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟକାର ସୁନ୍ଦର ପରିପ୍ରକାଶିତିରେ ପୂଜେ ଧରାଇ ଦେଖା ହେଲେ ।

ପାଶାପାଶ ବାଂଜା କାହିଟିର ଦୈତ୍ୟକ ରଙ୍ଗିତ ଏବଂ ପ୍ରାସିନ ବାଂଜା ପ୍ରେସିଲ କଂଗାରୁ ଓ ବ୍ୟାଥ୍ୟକାର କାହିଟିବିଶାରଦ ଆବଦୁଳ କାହିଯେଇ ଭାବରେ ଏକାଟ ବିଶେଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି । କରାବରେ ଅତ୍ୱି ଏବାରେ କଂଥ୍ଯା ବୁଝ ନିଜିତ୍ତ, କବିତା, ଗଜି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦିଲେ କାଜମ୍ବି ହେଲେ ।

ଫ୍ରେଶର୍

ଜ୍ଞାତୀୟ ଚାନ୍ଦ ମେଡ଼ିଆ

କୈମାନ ନାରୁଳ ଇମଲାଯ
ପାଞ୍ଜାନୀନ ଆହମଦ
ବ୍ୟାପ୍ଟେନ ମନ୍ଦୁର ଆଲୀ
ଏ.ଏୟୁ.ଏମ କାମରଙ୍ଗଜାମାନ

অনলাইন সাহিত্য সাময়িকী
ব্যাপ্সান্স লিটারেচার

বর্ষ ১। সংখ্যা । অক্টোবর ২০২০

স্ব শ্বাদ বা
মাইফুল ইসলাম খান
ফয়সাল আহমেদ

নি বা হী স্ব শ্বাদ বা
সুহৃদ কাদিবা
শামেন্দু শামাত্রসাদ

স হ বা রী স্ব শ্বাদ বা
কাদিবা মাহবুব ইসলাম
বাঁধন বুনার ঘোষ

প্র প্র দ
কায়মা বেগম

ছ বি স্ব প্র
ইন্টারনেট

মো গা মো গ অ থ বা লে খা পা ঠা মো র ঠি বা না
Campus.lit.org@gmail.com

শূচিপত্র:

প্রবন্ধ

তারঞ্জিভো প্রাণ তাজউদ্দীন/সুলতান আজাদ
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ: মৃত্যুহীন শিল্পাণ্ড/মোছা:
শিরিনা খাতুন
দীর্ঘস্থায়ী শোকসভা: শ্রেতের বিপ্রতীপে অন্য
শ্রেত/প্রথম রং
আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার বহুবিতর্কিত অঞ্চল
নাগোর্নো-কারাবাখ এবং যুদ্ধ/তর্নিকা হাজরা

বুক রিভিউ

গিয়াস শামীমের উপন্যাসের শিল্পস্বর: নিরীক্ষার
অনাস্থাদিত সারবত্তা/সুহৃদ সাদিক
যদ্যপি আমার গুরু: গুরু শিষ্যের অনন্য আখ্যান/সাইফা
শাস্তা

গল্প

বরা পাতার অভিলাষী মন/রাগীব আবিদ রাতুল
কর্তৃস্বর/পারঙ্গল
শেষ করেকটি ফেঁটা/রিয়াজ উদ্দিন মুন্না
জয়া/প্রদীপ্তি দে চৌধুরী
হেলেন/সাদিক মাহবুব ইসলাম
দায়/মাহমুদ আব্দুল্লাহ

কবিতা

ভাবনার গোড়ায় পচন ধরা/আজফার মুস্তাফিজ
তারা কথা রাখেনি/সৃজিত সিঙ্ক
তোমাকে একটা গল্প শোনাতে চাই/জারিন তাসনিম
তথাপি

ভীতি/তরিকুল ইসলাম
নারী নয়, ইশ্বর ধর্ষিত হয়/রাজিব খান
বিচার/আয়মান আনসারী অন্তরা
স্বগতোক্তি, সেক্যুলারের/পুরুষোত্তম চিরকিশোর

জেলা হত্যা সংখ্যা

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ

বুক রিভিউ এক ধারণা

গল্প

গল্প

কবিতা কাব্য





କାମପାତ୍ର ଲିଟାରେଚାର
ବର୍ଷ ୧ | ସଂଖ୍ୟା ୬ | ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୦



তারংশ্যভূত প্রাণ তাজউদ্দীন

সুলতান আজাদ

স্বাধীনতার রঙিন সূর্য দেখার জন্য আমাদের দীর্ঘদিন
অপেক্ষা করতে হয়েছে, দিতে হয়েছে চরম মূল্য।
পলিমাটি ঘেরা, সবুজ-শ্যামল এই দেশের মাটিতে
দুর্বাঘাসের উপর নিশ্চিতে শুয়ে শিশির কণার পরশ
পাবার জন্য কিংবা আষাঢ়ের রিমবিম বর্ষণে ভিজতে
ভিজতে হারিয়ে যাবার স্বাদ পেতে বলিদান দিতে
হয়েছে কত তাজা প্রাণ, সন্তুষ্ম হারাতে হয়েছে কত
নারীকে। রোদ ঝালমল বাংলার প্রত্যুষ লগ্নের অন্ধকার
দূর করার জন্য ফাল্গুনের কড়া নাড়ার শব্দে জ্বলে
উঠতে হয়েছে হোমশিখার মতো দাউডাউ করে।
তিতিক্ষার মন্ত্র অবশ্য এদেশের মাটিই দিয়েছিল।
বাংলার গণমানুষ কাল কাল ধরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করেছে। বহু কৃষক, গারো-হাজং-সাঁওতাল
সিপাহী ভাষার জন্য, স্বাধীনতার জন্য মরণপণ বিদ্রোহ
করেছে। ফলে এই প্রেরণার উৎসারিত আলোকের

উজ্জ্বল-দীপ্তি রাগে আমরা বিজয়ের উৎসব করেছি,
কঢ়ে ধারণ করেছি স্বাধীনতার মাল্য।

হাজার বছরের ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা
যায়, ১৯৭১ এর আগে বাঙালির কোনো নিজস্ব রাষ্ট্র
ছিল না। ছোট ছোট রাজারা বাংলাকে নানান খণ্ডে ভাগ
করে শাসন করেছে দীর্ঘকাল। তারপরে কখনো
উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে শাসকরা এসে
বাংলা শাসন করেছে, কখনো বা শাসক এসেছে
উপমহাদেশের বাইরে থেকে। বাঙালির জন্যে বাঙালি
দ্বারা পরিচালিত কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের চিন্তা প্রথম
আসে বিটিশরা চলে যাবার আগ মুহূর্তে। ওই সময়ে
বাংলার প্রগতিশীল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতারা
প্রথম বাঙালির জন্যে একটি আলাদা রাষ্ট্র গড়ার
উদ্যোগ নেন।

এর আগে একমাত্র লেখক ও বুদ্ধিজীবী এস.ওয়াজেদ আলী বাঙালির জন্যে একটি আলাদা রাষ্ট্রের কথা লেখেন একটি লেখায়। তাঁর ওই লেখা এবং বাংলার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিশীল রাজনীতিকদের ওই উদ্যোগ ছিল বড়ই বিপরীতমুখী একটি সময়ে। কারণ, এস. ওয়াজেদ আলী যখন লেখেন সেটা ছিল একক ভারতবর্ষ স্বাধীন করার সংগ্রামের সময়, যার নেতৃত্বে ছিল বাঙালিরা। অন্যদিকে, যে সময়ে পূর্ব বাংলা পাকিস্তান আন্দোলনের জোয়ারে ভাসছে, পূর্ব বাংলার বেশিরভাগ মুসলিম পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছে, ওই সময়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রগতিশীল নেতাদের বাঙালির জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ ছিল খুবই কঠিন সিদ্ধান্ত। অনেকেই একে ‘অসময়ের উদ্যোগ’ বলেছেন। পরবর্তীতে অবশ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিকে একটি নিজস্ব রাষ্ট্রের দ্বারে নিয়ে আসেন। বাঙালির একটি জাতিরাষ্ট্র গড়ার জন্য মাত্র ২৩ বছরে তিনি বাঙালিকে শুধু বাঙালি জাতীয়তাবাদে ঐক্যবন্ধ করেননি; বাঙালির আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও অন্য সকল মুক্তির জন্য তাকে প্রস্তুত করেন। কয়েক হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় ১৯৭১ সালে তাঁর হাত ধরে বাঙালি সেই মাহেন্দ্রক্ষণে এসে দাঁড়ায়। তবে মুক্তিযুদ্ধের বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে যিনি অস্থায়ী সরকার গঠন করে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে রেখেছেন কার্যকর ভূমিকা তিনি বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫ - ১৯৭৫)। তাজউদ্দীন আহমদের জন্য ১৯২৫ সালে। কিশোর বয়সেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি। ফলে সংবেদনশীল তাজউদ্দীন যুগের হাওয়াতেই কর্তব্যজ্ঞানের কারণে কিশোর বয়সে রাজনীতিতে সক্রিয় হন। বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলন ও সমাজসেবায় তাঁর উপস্থিতি ছিল অনিবার্য। এখনকার অনেক ছাত্রনেতাকেই দেখা যায়, রাজনীতি করতে গিয়ে ছাত্রত্বের পরীক্ষায় তারা সাফল্যের পরিচয় দিতে পারছেন না। কিন্তু তাজউদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। শিক্ষা এবং রাজনীতি দুই ক্ষেত্রেই তিনি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে দ্বাদশতম স্থান লাভ করেন। রাজনীতিতে অধিক মাঝায় জড়িয়ে পড়ায় সময়মতো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ হন। পরের বছরও তাঁর পরীক্ষা দেবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মাঝের চাপের মুখে পড়ে পরীক্ষা দেন। উল্লেখ্য তাজউদ্দীন এতে প্রথম বিভাগে চতুর্থ হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তবে প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফন্টের প্রার্থী হিসেবে অংশ নেয়ার কারণে ১৯৫৪ সালে এম.এ. পরীক্ষা দিতে পারেননি। পরবর্তীতে এম.এল.এ নির্বাচিত হয়েও তিনি আইন বিভাগের ছাত্র হিসেবে নিয়মিত ক্লাস করেছেন এবং জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় পরীক্ষা দিয়ে আইনশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন তাজউদ্দীন যে পরবর্তীতে এত বড় মনীষী হতে পেরেছেন তার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা তাঁর মাঝের। শারমিন আহমদ লিখেছেন, “নেপোলিয়ন বলেছিলেন, তোমরা আমাকে ভালো মা দাও, আমি তোমাদের ভালো জাতি উপহার দেব।” একজন ভালো মা পেতে হলে প্রয়োজন পরিবার ও সমাজের সহায়তা। নারীর আত্মনির্ভরশীল চিন্তা ও চেতনার বিকাশে সহায়ক সমাজেই সৃষ্টি হতে পারে মানুষ গড়ার কারিগর সুদক্ষ মা ও সুন্দর সন্তান। শাল-গজারির বনে ঘেরা গ্রামে বড় হওয়া দাদির মতো অগ্রগামী চিন্তাচেতনা-সম্পন্ন দৃঢ়চেতা সাহসী মাঝের দেওয়া অনন্য উপহার ছিল আবুর মতো বিশাল হৃদয়ের অকুতোভয়, সংগ্রামী, ত্যাগী ও দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়ক।”

তাজউদ্দীন দলের সকল কর্মকাণ্ডের মূল প্রণেতা হলেও, বরাবরই তিনি ছিলেন প্রচারবিমুখ। আওয়ামীলীগ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর তিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপন করেন। ছয় দফা প্রণয়নের সাথে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, অর্থনীতিবিদ আখলাকুর রহমান, রেহমান সোবহান প্রমুখ যুক্ত থাকলেও, তাজউদ্দীনই এর চূড়ান্ত রূপটি দেন। এই ছয় দফার ভিত্তিতেই আওয়ামীলীগ

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে। উল্লেখ্য জয়লাভ করার পরও পাকিস্তানি সামরিক শাসকচক্র বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করে। এতে সমগ্র বাঙালি জাতি সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠে। অতর্কিংতে ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ গভীর রাতে হানাদাররা বাঙালি জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গণহত্যা শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিজ বাসভবন থেকে হোগ্তার হন। অবশ্য এর পূর্বেই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সাত মার্চের ভাষণেও পরোক্ষভাবে ছিল স্বাধীনতার ইঙ্গিত। একথা খুব বেশি লোকের জানা নেই যে, সাত মার্চের ভাষণের মূল পয়েন্টগুলো তাজউদ্দীনের মন্তিক্ষপ্রসূত।

বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সমস্ত দায়িত্ব তাজউদ্দীন আহমদের উপরই বর্তায়। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সহায়তা চাইলেও, হস্তক্ষেপ না করতে অনুরোধ করেন। ৩ এপ্রিল ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করে তিনি বলেন, “এটা আমাদের যুদ্ধ, আমরা চাই ভারত এটাতে জড়াবে না। আমরা চাইনা ভারত তার সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে আমাদের স্বাধীন করে দিক।” যাই হোক, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সহায়তার প্রতিশ্রূতি দিলে তিনি আওয়ামীলীগের এম.এন.এ এবং এম.পি.এ.দের নিয়ে কুষ্টিয়া জেলার সীমান্তে অধিবেশন আহ্বান করেন। সেখানে সর্বসমতিক্রমে মুক্তিযুদ্ধ ও সরকার পরিচালনার জন্য মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এতে রাষ্ট্রপতি করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাজউদ্দীন আহমদ হন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারতেন। এটি তাঁর জন্য চ্যালেঞ্জিং বিষয় ছিল। কারণ অনেকেই তাজউদ্দীনের নেতৃত্ব মেনে নেননি এবং তারা তাজউদ্দীনের বিরুদ্ধে ঘড়্যন্ত্র শুরু করেন। কিন্তু এই প্রতিকূল মনোভাবের মধ্যেও তাজউদ্দীন ছিলেন অচল। তিনি নিভৃতে করে গিয়েছেন তাঁর কাজ। ১৯৭১ সালের দশ এপ্রিল দেয়া তাঁর বেতার ভাষণটি বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি অমূল্য দলিল। সেখানে তিনি বলেন, “আমাদের এই পবিত্র দায়িত্বপালনে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে গেলে চলবে না যে এ যুদ্ধ গণযুদ্ধ এবং সত্যিকার অর্থে এক কথাটি বলতে হয় যে, এ যুদ্ধ বাংলাদেশের দুঃখী মানুষের যুদ্ধ। খেটে খাওয়া সাধারণ কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা তাদের সাহস, তাদের বিশ্বাস, তাদের দেশপ্রেম, স্বাধীন বাংলাদেশের চিন্তাই তাদের নিমগ্নপ্রাণ, তাদের আত্মাহত, তাদের ত্যাগ ও তিতিক্ষায় জন্ম নিল এই নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ।... যারা আজ রক্ত দিয়ে উর্বর করেছে বাংলাদেশের মাটি, যেখানে উৎকর্ষিত হচ্ছে বাংলাদেশের নতুন মানুষ, তাদের রক্ত আর ঘামে ডেজা মাটি থেকে গড়ে উঠুক নতুন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা।” তাজউদ্দীনের গতিশীল নেতৃত্বের জন্য মাত্র নয় মাসেই বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় তিনি অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রী হিসেবে আত্মনির্ভর, বিকাশমান অর্থনীতি গড়ে তোলার জন্য তিনি বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৭৪ সালের ২৬শে অক্টোবর তিনি মন্তিক্ষ ছেড়ে দেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবার নিহত হন বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দীন আহমদ হন অন্তরীণ। বন্দি অবস্থাতেই ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তাঁকে এবং অপর জাতীয় তিনি নেতাকে। তিনি আজীবন নির্লোভ ছিলেন, ছিলেন অপরের হিতকামী সুহৃদ। বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের চির অক্ষয় হয়ে লেখা রবে তাঁর অবদান।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ: মৃত্যুহীন শিল্পপ্রাণ

মোছা: শিরিনা খাতুন

সাহিত্য-পিপাসু মন ও মননের অধিকারী ব্যক্তিত্ব যেমন স্বকীয় সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমে সাহিত্যাঙ্গনের সুবিশাল পটে রেখে যেতে পারেন আপন পদচিহ্ন, তেমনি কেউ বা নিজেকে প্রতিনিয়ত ঝন্দ করতে পারেন সাহিত্যরস আস্থাদনের মাধ্যমে। আবার এমন ব্যক্তিত্বের সন্ধানও আমরা সময়ে সময়ে পেয়ে থাকি যাদের অন্বেষক সন্তা ও সাহিত্যের প্রতি নিদারণ ভালোবাসা-এই দুইয়ের সংযোগে সম্মদ্ধ হয় সাহিত্যভূবন এবং এরই মাধ্যমে তারা ব্রতী হন ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে। এমনই একজন মানবসন্তান আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩)। তিনি একইসাথে সাহিত্যিক, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা, প্রাচীন বাংলা পুঁথির সংগ্রাহক এবং ব্যাখ্যাকার। বাঙালির বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের সম্মদ্ধ ঐতিহ্য অন্বেষণে তিনি রেখেছেন অনন্য ভূমিকা।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জন্ম বৃহত্তর চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী গ্রামে। গ্রামের একটি হিন্দু মহল্লায় ছিল তার পৈতৃক নিবাস। উচ্চশিক্ষিত হিন্দুদের পরিবেশে থেকে তিনি বড় হয়েছেন। এছাড়া তার নিজের পরিবারও ছিল মোটামুটি শিক্ষিত ও ঐতিহ্যবাহী। তাই পরিবার ও পরিপার্শ্ব উভয় দিক থেকেই তিনি পেয়েছেন শিক্ষার পরিবেশ। তার পিতার নাম মুনশী নূরউদ্দীন এবং মাতার নাম মিশ্রীজান। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময়ে তার পিতার মৃত্যু হয় এবং মাত্র সতের বছর বয়সে

তিনি মাকেও হারান। উল্লেখ্য বাংলা সাহিত্যের আরেক প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব আহমদ শরীফ (১৯২১ - ১৯৯৯) ছিলেন তার ভ্রাতুষ্পুত্র।



তার শিক্ষাজীবনের আরম্ভ পারিবারিক গঙ্গি থেকেই। তৎকালীন স্বচ্ছল ও মোটামুটি শিক্ষিত পরিবারের রেওয়াজ অনুসারে পারিবারিক আবহে তিনি আরবি-ফারাসি-উর্দু ভাষাশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে গ্রামের মধ্য বাংলা স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে এক বছর পাঠ গ্রহণ করে পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখান থেকেই ১৮৯৩ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলে তাকে সংস্কৃত পড়তে হয়েছিল যা কিনা পরবর্তীতে তার জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, তিনিই সম্ভবত আধুনিক যুগে সংস্কৃত পড়া প্রথম

মুসলমান। চট্টগ্রাম কলেজে দুই বছর অধ্যয়ন করলেও, পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্বে টাইফয়েডে
আক্রান্ত হওয়ায় তার আর এফ.এ পাস করা হয়নি। ক্রমশ পরিবারের আর্থিক অবস্থার অবনতি, শারীরিক অসুস্থতা
প্রভৃতি কারণে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া সমাপ্ত করে তাকে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়।

কর্মজীবনের প্রারম্ভে চট্টগ্রাম পৌর বিদ্যালয়ে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। এরপর এক বছরের চুক্তিতে সহকারী
প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন সীতাকুণ্ড মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে। চট্টগ্রাম সাব জজ আদালতে তিনি শিক্ষানবিশ
করণিক পদে চাকুরি করেছেন তিনি। ১৮৯৭ সালে পটিয়ায় দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালতে বদলি হন। ঘড়্যন্ত্রের শিকার
হয়ে সেখান

থেকে তিনি চাকরিচ্যুত হন। ১৮৯৯ সালে আনোয়ারা মধ্য ইংরেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নেন। ১৯০৫
সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করেন। অন্যত্র কাজের সুযোগ থাকলেও তিনি নিজ জন্মভূমি ছেড়ে যেতে
চাননি, কারণ পুরির প্রতি তার ছিল ঐকান্তিক ভালোবাসা। আনোয়ারা স্কুলের চাকুরি শেষে তিনি চট্টগ্রাম শহরে চলে
আসেন বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর অফিসে কেরানীর চাকুরি নিয়ে। অবসরের পর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাকে
প্রথমে প্রবেশিকায় ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএ ক্লাসের বাংলার পরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। ১৯৪৭
সাল পর্যন্ত তিনি এই কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্সের একটি পত্রের
প্রশংকর্তা ও পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ইতিহাসের একটি বিশেষ অংশ পুরি সাহিত্য। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ধ্যানমঞ্চ
যোগীর ন্যায় পুরি সংগ্রহ ও চৰ্চা করেছেন। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তার জীবনই আবর্তিত হয়েছিল
পুরিকে কেন্দ্র করে। উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হয়েও এই নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব মধ্যযুগের গহ্বর থেকে হারিয়ে যাওয়া
এক ইতিহাস তথা গৌরবনীপ্তি ভাঙ্গার আবিষ্কার করেন। পুরির প্রতি তার সাধনা এসেছিল পারিবারিক ঐতিহ্য
থেকেই। তখনকার সময়ে মুসলমানদের বাড়িতে বাড়িতে বসত পুরি পাঠের আসর, যা তাকে পুরিচর্চায় নিবিষ্ট হতে
প্রেরণা যুগিয়েছিল। নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘অনুসন্ধান’ পত্রিকা পাঠের পর তিনি
প্রাচীন পুরি সংগ্রহের উৎসাহী উদ্যোগ্তা হন। কোনো প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ব্যতিরেকে, সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগে
চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পাবনা বা বাখরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে তিনি পুরি সংগ্রহ করেছেন। এজন্য তাকে বহু ত্যাগ
স্বীকার করতে হয়েছে, খরচ করতে হয়েছে ব্যক্তিগত অর্থ।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ পিতামহের সংগ্রহীত পুরি পাঠের সময় চান্দিদাসের পদাবলির সঙ্গান পান। এটিকে
তিনি ‘পুর্ণিমা’ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। আনোয়ারা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনকালে তিনি অংশ পুরি সংগ্রহ
করেন। প্রথম পুরিটি সংগ্রহ করেন এক কৃষকের ঘর থেকে, সেটি ছিল আলাওলের পদ্মাবতী কাব্যের প্রাচীন
পাত্রলিপি। তিনি পুরি সংগ্রহের সাথে সাথে এর বিবরণী প্রকাশ করাও শুরু করেন। এগুলোর কিছু কিছু বঙ্গীয় সাহিত্য
পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ থেকে ১৯১৪ সালে তার লেখা পুরির তালিকা ‘বাঙালা প্রাচীন পুরির বিবরণ’
নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এই কার্য সমাধা করেন। তার মৃত্যুর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
সংরক্ষিত পুরির তালিকা বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৫৮ সালে পুরি পরিচিতি নামে প্রকাশিত হয়। জীবদ্ধশায় তিনি

মুসলমান রচিত এবং হিন্দু রচিত পুঁথির পৃথক বিবরণী তৈরি করেন। মুসলমান রচিত পুঁথিগুলি ১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে দান করেন। হিন্দু রচিত পুঁথিগুলি তার মৃত্যুর পর আহমদ শরীফ রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে শর্তসাপেক্ষে দান করেন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ জীবনের সুদীর্ঘ সময় মধ্যযুগের সাহিত্যিক ঐতিহ্য পুঁথি সংগ্রহ, উদ্ধার, পুঁথির বিবরণী প্রকাশ, প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনার কাজে ব্যয় করেছেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ চর্চার পথিকৃৎ। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ চট্টল ধর্মঙ্গলী ১৯০৯ সালে ‘সাহিত্যবিশারদ’ এবং ১৯২০ সালে নদীয়া সাহিত্যসভা ‘সাহিত্যসাগর’ উপাধিতে ভূষিত করে। বাংলা সাহিত্যের শুভাকাঙ্ক্ষী এই মহান মনীষী ১৯৫৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তবে আমাদের মনে এখনো জাগরুক রয়েছেন তিনি, এখনো দৃঢ়ত ছড়াচ্ছে তার কর্ম। তিনি বাংলা সাহিত্যের মৃত্যুহীন শিল্পপ্রাণ।

দীর্ঘস্থায়ী শোকসভা: শ্রোতের বিপ্রতীপে অন্য শ্রোত

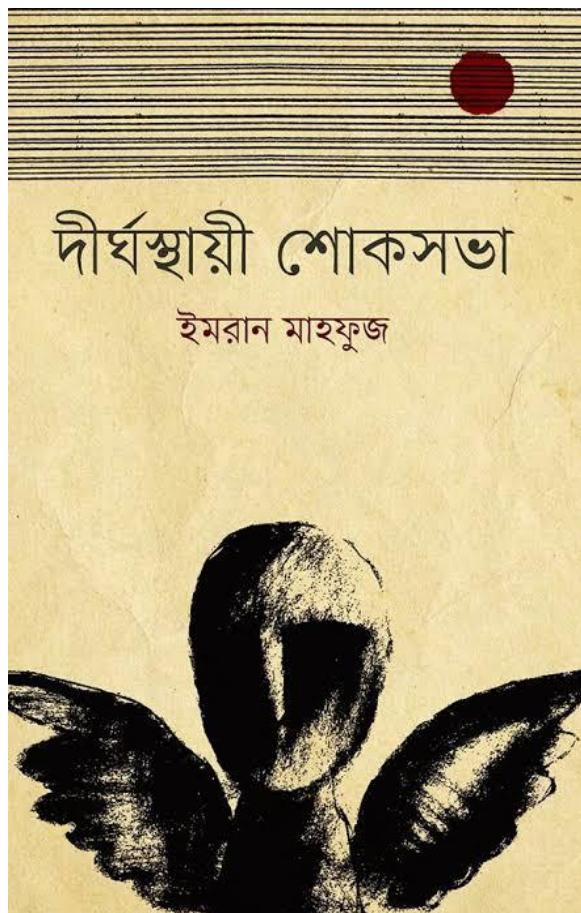
প্রথম রূপ্ত্ব

সীমাহীন অন্ধকারের বেলাভূমিতে আটকে না থেকে,
জীবনবোধ ও সৃজনীকল্ননার বাহ্যিক সম্মিলনে
অরংগোদয়ের নিবিড়ে মিলবার স্বপ্নসাধই কবিতা।
আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার ক্রমায়ত পথ্যাত্মায় বাঙালি
জাতির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে যে
আলো-অন্ধকারের দোদুল্যমানতা, অনিশ্চয়তা ও
অবক্ষয় এসেছে; সম্পূর্ণরূপে
না হলেও অনেক কবির
কবিতাতেই আমরা তার
দৃষ্টিময় উপস্থিতি প্রত্যক্ষ
করেছি। অবশ্য প্রলম্বিত
লয়ে হলেও কাব্যভাষা,
শৈলি, প্রতীক ও চিত্রকলার
প্রচলিত পরিকল্পনার প্রতি
অনাঙ্গ জ্ঞাপন করে
অনেকেই পাশ্চাত্য দর্শন ও
রহস্যময়তার ভাবলোকে
অবগাহনের প্রচেষ্টায়
হয়েছেন আত্মামুখী এবং
আত্মকেন্দ্রিক। সুতরাং
সমাজ, সময় ও
সমকালস্পর্শী জীবনানন্দের
মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দূর
দিগন্তে উড়য়নের
ঐকান্তিকতার নামই কবিতা।

তবে দীর্ঘকাল ধরে আলোর দাপটে সেই অন্ধকার
জগৎ ছিল পর্যুদন্ত। কিন্তু তরঙ্গ কবি ইমরান মাহফুজ
তাঁর ‘দীর্ঘস্থায়ী শোকসভা’ গ্রন্থে সেই বিবরণীয়ার ধূসর
জগতকেই আঁকতে চেয়েছেন নিঃসঙ্কোচে।

‘দীর্ঘস্থায়ী শোকসভা’ ২০০৫ থেকে ২০১৭ সালের
মধ্যে মা, মাটি, মানুষ, নদী, নারী প্রকৃতি, সমাজ ও
রাষ্ট্রের প্রতি কবির দৃষ্টিভঙ্গির সানুপুঞ্জ ঝর্পায়ণ। এ
কবিতাগুলোর দ্বারা তিনি শিল্পের জমিতে বাস্তবতার
বীজ প্রোথিত করেছেন যার অপূর্ব সুবাস অনুপম
মোহে আচ্ছন্ন করে তোলে
পাঠককে; আর পাঠকের
চিন্তকে করে তোলে
দ্বিদাদীর্ঘ। উপরন্তু ‘মাধ্যমিক
সকাল: গাছের ছায়ায় মাছের
জীবন’, ‘উচ্চ মাধ্যবিক
সকাল: মেঘের আয়োজনে
নগরে মিছিল’ ও ‘সম্মান
সকাল: মুখোশের পাঠশালায়
ঘাসফুলের কান্না’ শীর্ষক
তিনটি পর্বে কবিতাগুলোকে
ভাগ করে কবিতাকে
জীবনের সাথে সমীকৃত
করেছেন। এ ধরনের
অভিনব চিন্তা তাঁর লেখাকে
কেবল চমকপ্রদই করেনি,
লেখায় নিয়ে এসেছে নতুন
সুর। জীবনানন্দ বলেছিলেন,
‘সকলেই কবি নন। কেউ

কেউ কবি।’ ইমরান মাহফুজের কবিতা সচেতনভাবে
পাঠ করলে তাঁকে কবির তকমা দিতে তিলমাত্
ভাবতে হয় না। কালের স্নোতে হারিয়ে যাওয়ার জন্য
যে ইমরান কাব্যজগতে পদার্পণ করেননি তার শক্ত
প্রমাণ ‘দীর্ঘস্থায়ী শোকসভা’।



বর্তমানে পুঁজিবাদের করালগ্রাসে সমগ্র বিশ্ব আক্রান্ত; ক্ষত-বিক্ষত সমাজ, সময়, শিল্প ও সাহিত্য। সভ্যতার বিপর্যস্ত কক্ষালের ওপর দাঁড়ালে কবিতাও মূক হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে সন্তুষ্ট। কবিতা অন্তর্দৃষ্টির সর্ববিস্তারী নির্যাস। কিন্তু সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের ফলে স্বপ্নমুখের কবিতা উত্তরণসম্ভাবনার দোরগোড়া থেকে ছিটকে, বেদনার্ত মীমাংসায় উপনীত হয় ; হয় সবার করণার পাত্র। ইমরান তাই লিখেছেন,

“মুহূর্তে পিচচালা মাঝাপথে, ধূসুর সময়ের আলিঙ্গনে থমকে দাঁড়ায়। খুটব যে, বিপাকে জন্মান্ধকবিতা। করণ গোঙানি ছাড়া কিছুই নিঃস্ত হয় না কঢ় থেকে। অসহায় কবিতার যাত্রা দেখে, রোদের পকেট থেকে বৃষ্টি ; গন্তব্যে পেঁচার একটি হলুদ চিঠি এগিয়ে দেয়।”

আর এই ব্যর্থতা ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত চরাচরব্যাপী। কেউ রেহাই পায় না তার হাত থেকে। তখন,

“সাইরেন বাজায় মাটিমগ্ন কৃষক—
পৃথিবী জুড়ে আপেল হাহকার।”

দেশপ্রেম ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্নেষ ঘটায়। ১৯৭১ সালে যে বোধ বা চেতনাকে সামনে রেখে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর অতিক্রান্ত হলেও কার্যত অদ্রশ্য সেই চেতনার এখনো শুভ উদ্বোধন ঘটেনি। বৃহত্তর এই জনগোষ্ঠী স্বার্থপরতা, নেতৃত্বাচকতা ও স্বৈরতান্ত্রিক অপশাসনে হারিয়ে ফেলেছে তার আমিত্তকে। কবি উপলক্ষ্মি করছেন মানুষ কি আদৌ প্রাণচৰ্ষণ ও গতিময় নাকি সে পণ্য; কর্পোরেটদের কাছে বিক্রি হওয়ায় তার পরিণতি? ‘পরিচয়’ কবিতাতে দেখি,

ইমরান মাহফুজ -

“এক বৃক্ষের নাম, তাকালে দৃষ্টি বাড়ে
কর্পোরেটদের আগ্রহ—না, বৃক্ষ কারো একার হয় না!”

তবে বাংলাদেশ নিয়ে তিনি যে ভাব ব্যক্ত করেছেন তা সত্যিই সংহত, সুচিত্তি ও বাস্তব। যুগপৎ বৃত্তাবদ্ধে আত্মসমর্পণ না করে ইমরান দৃঢ়ভাষায় লিখেছেন,

“অসুখী নদীতে ঢেউ নেই
কঢ়ে পাথির গান নেই, সুরে নেই আবেশ
চোখে নেই স্বপ্ন, মায়ের কানে সোনাও নেই!
সব হারিয়ে সিটিগোল্ড বাংলাদেশ!”

কোনো উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বক্তব্য প্রকাশ করলে কবিতা পর্যবসিত হয় স্লোগানে, ক্ষুণ্ণ হয় এর শিল্পমান। কিন্তু উদ্দেশ্যবাদী প্রাচারপত্রের পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে কবিতাটি হয়ে উঠেছে শোষিত কাননের দলিত অথচ সুগন্ধী কুসুম। ইমরান মাহফুজ একজন প্রাঞ্জ শব্দ কারিগর। তাঁর শব্দব্যবহার নিপুণ এবং মনোলীন ক্যারিশমায় সমুজ্জ্বল। কবি আবদুস সাত্তার তাঁর আত্মপ্রকৃতকৃতিতে লিখেছিলেন, “আমাকে কিছু না কিছু লিখতেই হবে। এবং লেখার মলম

দিয়ে সব রকমের দুঃখের ক্ষত নিরাময় করতে হবে। লেখা আমার অস্থিমজ্জার সঙ্গে জড়িত। আমিই লেখা।” ইমরান
মাহফুজের সাথেও এই কথা সম্পূর্ণভাবে মনোলীন এক্যসূত্রে যুক্ত। একজন জাত-কবি বলেই তিনি অজ্ঞানভাবে স্থিত
করে চলছেন শব্দের খেলনা। মা, মাটি ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তিনি যেসব কবিতা লিখেছেন, অসংখ্য
পাঠক তা পাঠ

করে ঝান্দ করবে নিজেদের-এই আমাদের বিশ্বাস।

আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার বহুবিতর্কিত অঞ্চল নাগোর্নো-কারাবাখ এবং যুদ্ধ

তর্ণিকা হাজরা



স্মো ভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দুইটি দেশ হচ্ছে আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া। অবস্থানগত দিক থেকে দুইটি দেশই দক্ষিণ কক্ষেশাস অঞ্চলে কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরের স্থল যোজকের উপর অবস্থিত। আজারবাইজানের পশ্চিমে অবস্থিত আর্মেনিয়া দেশটি। দেশ দুটোর মধ্যকার বিরোধপূর্ণ একটি এলাকা হচ্ছে নাগোর্নো-কারাবাখ। এই পাহাড় ও বনভূমি আচ্ছাদিত নাগোর্নো-কারাবাখ অঞ্চল নিয়ে দশকের পর দশক ধরে বৈরী সম্পর্ক চলছে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে। সম্প্রতি এ দ্বন্দ্ব-সংঘাত চরম ধ্বংসাত্মক রূপে পরিণত হয়েছে।

সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম জাতি নিয়ে গঠিত আজারবাইজান এবং খ্রিস্টান অধ্যুষিত আর্মেনিয়ার স্বাধীনতা লাভ হয় ১৯৯১ সালে। স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের বহু পূর্ব থেকেই এই নাগোর্নো-

কারাবাখ নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। এই বহুবিতর্কিত অঞ্চলটি আন্তর্জাতিকভাবে আজারবাইজানের অংশ হিসেবেই স্বীকৃত [১]। কিন্তু ১৯৮৮ সালে কারাবাখ আন্দোলনের সূচনা হওয়ার পর থেকে আজারবাইজান এ অঞ্চলে তার রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। ১৯৯১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর দুটো দেশের মধ্যকার সংঘাত আরও বেড়ে যায়। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে, রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এই দুই দ্বন্দ্বমুখর দেশেদ্বয়ের সামরিক পদক্ষেপ। রাশিয়া ছাড়াও আরও কয়েকটি দেশের যোদ্ধাসহ ভার্ডাটে সৈনিক নিযুক্ত করা হয়েছিল এ যুদ্ধে [২]। ১৯৯৩ সালের শেষের দিকের সংঘাতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়, আহত হয় আরও ব্যাপক সংখ্যক এবং উভয় পক্ষেই লক্ষ লক্ষ শরণার্থী তৈরি হয়েছিল। নানা প্রকারের বিধ্বংসী ঘটনার পর ১৯৯৪ সালের ১২ মে রাশিয়ার আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশ যুদ্ধ বিরতির সিদ্ধান্তে পৌঁছায়। ১৯৯৪ সালে দুই

পক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত এই সংঘর্ষে প্রায় ৩০ হাজার মানুষ নিহত হয়

যুদ্ধবিরতি ঘোষণা সত্ত্বেও, আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের সেনাদের মধ্যে সশস্ত্র দ্বন্দ্ব বন্ধ হয়নি ; ফলে প্রাণহানি অব্যাহতই ছিল [৩]। নবৰই দশকের পুরোটা জুড়ে যে ধ্বংসাত্ত্বক মনোভাব দুদেশের মধ্যে তুমের আগুনের মতো জ্বলছিল, একবিংশ শতকের গোড়ার দিকেই তা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে । কয়েক বছর ধরেই বিশ্বনেতারা আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের সাথে নানা রকম আলোচনায় বসেছেন কিন্তু তারা যুদ্ধবিরতি রক্ষার চেষ্টায় সফল হতে পারেননি ।

২০১৬ সালের এপ্রিলের শুরুর দিকে আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার বাহিনী আবার এই অঞ্চলে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল । আর্মেনীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অভিযোগ করেছে যে আজারবাইজান এই অঞ্চল দখলের জন্য আক্রমণ চালিয়েছিল । যুদ্ধের সময় কমপক্ষে ৩০ জন সেনা নিহত হয়েছিল, হেলিকপ্টার ও ট্যাঙ্কও ধ্বংস করা হয়েছিল । [৪] সম্প্রতি ২৭ সেপ্টেম্বরে দুই দেশের মধ্যে নাগোর্নো-কারাবাখ এর দখল নিয়ে সহিংসতা তীব্রভাবে শুরু হয়েছিল । এ মারাত্মক বিধ্বংসী যুদ্ধের পর থেকে দক্ষিণ কক্ষেশাসের এই ক্ষুদ্র অঞ্চলটি কয়েকশ সেনা ও বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যু, উল্লেখযোগ্য সম্পদ ধ্বংস এবং স্ফীত উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে, যা কয়েক দশক ধরে চলমান সংঘাতকে আরও তীব্র করে তুলেছে । সংবাদ মাধ্যম থেকে জানা যায় যে, বিশ্বনেতারা যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানালেও এ অঞ্চলে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের যুদ্ধ বন্ধ হয়নি । উভয় দলের ভিতরেই ছিল ভারী গোলাবর্ষনের প্রবণতা ।

দীর্ঘ তিন বছর ধরে পুরনো যে সংঘাত থেমে থেমে জেগে উঠেছে, তাতে এবার নতুন মাত্রা দিয়েছে ড্রোনের ব্যাবহার । পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে, তুরস্কের তৈরি ড্রোন এবারের যুদ্ধের ধ্বংসের মাত্রার পরিবর্তন ঘটিয়েছে । আজেরি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ড্রোন থেকে পাওয়া ভিডিও ফুটেজ ও ছবি থেকে পাওয়া যায় এক ধরনের চরম ধ্বংসাত্মক ও আত্মাত্মী বিমানের উপস্থিতি যা চালকবিহীন থাকে । এ বিধ্বংসী বিমান বিভিন্ন বিস্ফোরক অঙ্গে সজ্জিত থাকে এবং লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত করে নিজেই বিস্ফোরিত হয়ে যায় । সংগৃহীত তথ্যের আলোকে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে সম্প্রতি দুটি দেশই তাদের অঙ্গের অধিক ধ্বংসাত্মীয় অঙ্গের যোগান দিয়েছে ।

বিবিসি অনলাইনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া যায় যে, মক্ষেতে ১০ ঘণ্টার টানা আলোচনার পর রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ বাংলাদেশ সময় সকাল ৬ টার দিকে শান্তিচুক্তির ঘোষণা দেন যে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে । লাভরভ দুই দেশ মূল আলোচনা শুরু করবে এমন অভিমতও দেন । রাশিয়ার মধ্যস্থতা করা এই যুদ্ধবিরতিতে দু'দেশই সহ করেছিল ।

এই ১০ দিনের যুদ্ধে প্রায় ৩০০ জনের বেশি মানুষ এতে মারা গেছেন এবং হাজারো মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়েছেন । দুপুর থেকে দুই দেশ যুদ্ধবিরতি পালন করবে; এ সময় দুই দেশের মধ্যে বন্দী বিনিময় ও মৃতদেহ বিনিময়ের সূযোগ পাবেন এমনটা ঘোষিত হলেও এ রায় স্থায়িত্ব পায় না; পুণরায় শুরু হয় ধ্বংসযজ্ঞ ।

বিতর্কিত নাগোরনো-কারাবাখ এলাকা নিয়ে দ্বিতীয় বারের মতো যুদ্ধবিরতি কার্যকরও করা হয় কিন্তু এবারেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায়, ঘোষণার মাত্র চার মিনিটের মাথায় তা ভেঙ্গে পড়ে । যুদ্ধবিরতি ভাঙার দায়ে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া, দু'পক্ষই পরস্পরকে দোষারোপ করছে । এর আগের সপ্তাহে বিবদমান এই দুই পক্ষের

মধ্যে হওয়া যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্যস্থতাকারী সেগেই ল্যাভরেট এবার উভয়পক্ষকে বলেছেন যে, দুই দেশেরই আগের চুক্তিটির শর্ত কঠোরভাবে মেনে চলা উচিত। জাতিসংঘের মুখ্যপাত্র জানান, সেক্রেটারি-জেনারেল আফসোস করেছেন যে উভয় পক্ষই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আহ্বানকে বারবার অগ্রহ্য করেছে এবং উভয় পক্ষই আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অধীনে বাধিত রয়েছে। এই এলাকায় ১৯৯৪ সালে যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে ছয় বছরের সংঘাতের অবসান হওয়ার পর এটিই সবচেয়ে ভয়াবহ নৃশংসতা।

বিবিসির সংবাদদাতারা গত কয়েকদিন দুই দিকের মানুষের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ, অবিশ্বাস, শত্রুতার মনোভাব এবং গভীর দেশপ্রেম প্রত্যক্ষ করেছেন। আজারবাইজানের কথা হলো বিতর্কিত এই ভূখণ্ডের দখল তাদের অসমাপ্ত একটি কাজ। কিন্তু আর্মেনীয়দের দাবি এই অঞ্চলটিতে তাদেরই জাতিগত অধিকার। আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান এর এই সাম্প্রতিক আঘাসী কর্মকাণ্ড বিশ্বের বুকে অভিশাপস্বরূপ। এই সংঘাত নিরসনের জন্য বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিকভাবে আলোচনাসভার আহ্বান করে সেখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়।

তথ্যসূত্র:

1. "General Assembly adopts resolution reaffirming territorial integrity of Azerbaijan, demanding withdrawal of all Armenian forces"
2. Human Rights Watch. Seven Years of Conflict in Nagorno-Karabakh. December 1994
3. No End in Sight to Fighting in Nagorno-Karabakh by Ivan Watson/National Public Radio. Weekend Edition Sunday, 23 April 2006
4. "Dozens killed in Nagorno-Karabakh clashes" | www.aljazeera.com
5. টিভি নিউজ
6. উইকিপিডিয়া

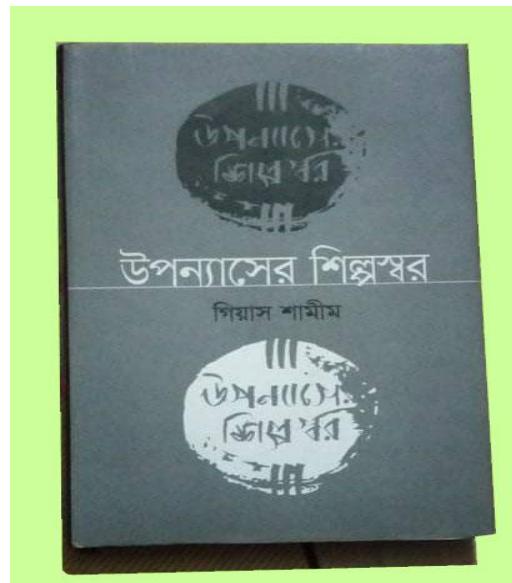
বুক রিভিউ

এন্ড এন্ড

বাস্পন্দী লিটারেচুর
বর্ষ ১ | অংখ্যা ৬ | অক্টোবর ২০২০

গিয়াস শামীমের উপন্যাসের শিল্পস্বরঃ নিরীক্ষার অনাস্থাদিত সারবন্ধা
সুহুদ সাদিক

বই: উপন্যাসের শিল্পস্বর
লেখক: গিয়াস শামীম
প্রকাশনী: ভাষাপ্রকাশ
ঢাকা, ২০১৯
মূল্য: ২৫০ টাকা



বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতির ফলে আমাদের সভ্যতার রথ এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। এরই সমান্তরালে জীবনের বিচ্ছিন্ন চৈতন্যে দীপ্ত অঙ্গৰ্ত উপলক্ষ শিল্পীর রচনার উপজীব্য হয়েছে। বর্তমানে বাংলা ও বাঙালির সর্বাধিক পাঠকপ্রিয় শিল্পমাধ্যম উপন্যাস। তালোবাসায় আর্দ্র, ব্যর্থতায় নীল, হিংসায় জ্বলজ্বল কিংবা জিঘাংসায় প্রমত্ত জীবনের বৈচিত্র্য সুচারুরূপে ফুটে উঠে উপন্যাসে। ডধঃবৎ অষ্টবহ লিখেছেন, “We find here a close imitation of man and manners ; we see the very web and texture of society as it really exists, and we meet it when we came into the world.” অর্থাৎ সমাজের বুননে মানুষ ও মানুষের রীতিনীতির পরিস্ফুটনই উপন্যাসে আমরা প্রত্যক্ষ করি। জীবনের সাথে যোগ রয়েছে বলে, উপন্যাস নিয়ে হয়েছে বিভিন্ন নিরীক্ষা, নানামুখী গবেষণা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের জনপ্রিয় অধ্যাপক ড. গিয়াস শামীমের ‘উপন্যাসের শিল্পস্বর’ সেই গবেষণাধারার বিশিষ্ট ও মূল্যবান সংযোজন। উপন্যাসবিষয়ক সাতটি প্রবন্ধের সংকলন এটি। শিক্ষকতা ও গবেষণাত্মক অর্জিত অভিজ্ঞতার বাস্তিত সম্মিলনে প্রবন্ধগুলো রচিত। নানা অনুসন্ধিৎসা ও নতুন নতুন দিক উন্মোচনের বহুমাত্রিকতাকে সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে প্রবন্ধগুলোতে।

‘উপন্যাসের শিল্পস্বর’ গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধের নাম ‘হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাথনমালা: ইতিহাসের শিল্পরূপ’। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একজন বিদৰ্ঘ ভারততত্ত্ববেত্তা হিসেবে অর্জন করেছেন প্রভৃতি খ্যাতি। নানাক্ষেত্রে

তাঁর অবদান থাকলেও বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন নির্দশন চর্যাপদে'র আবিষ্কারক হিসেবেই তিনি সমধিক পরিচিত। বহুপঠন, সনিষ্ঠ অনুশীলন ও শিল্পের প্রতি বিশ্বস্ততা তাঁকে গবেষণার পাশাপাশি উৎসাহী করেছে সৃজনশীল সাহিত্য রচনায়। বিশুদ্ধ সত্যের আলোকে শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তিনি রচনা করেছেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'কাঞ্চনমালা'। সম্মাট অশোকের জীবন ও রাজত্বকালের খণ্ডিত অংশকে কেন্দ্র করে এটি রচিত। প্রাবন্ধিক লিখেছেন, "প্রথম উপন্যাস 'কাঞ্চনমালা'য় তিনি অবলম্বন করেছেন বৌদ্ধ ধর্মেত্ত্ব, এবং অসাধারণ নৈপুণ্যে সুন্দূর অতীতের আলো-অঙ্ককারীময় জীবনবাস্তবতাকে উপস্থাপন করেছেন শিল্পরসে জারিত করে।" মূলত ভারতত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিশ্রের সাহচর্যই প্রাচ্য বিশেষত বৌদ্ধ শাস্ত্রে তাঁকে আগ্রহী করে তোলে। প্রবন্ধকার উপন্যাসের সারাংশ রচনা ও চরিত্রিক্রিয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে, শাস্ত্রী মহাশয়ের "Causes of the Dismemberment of the Maurya Empire" প্রবন্ধ আলোচনাপূর্বক উপন্যাসটির ঐতিহাসিক পাঠ বিশেষণে প্রয়োগী হয়েছেন। অবশ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সকল গবেষণালক্ষ তথ্যই যে আঙ্গবাক্য ছিল এমন নয়। সেজন্য আধুনিক গবেষকদের সঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের পার্থক্যের জায়গা ও বিষয়ও নিরূপণ করেছেন প্রাবন্ধিক। আর উপন্যাস পাঠের সময় প্রাবন্ধিক যে নির্মোহ থাকতে পেরেছেন, তার প্রমাণ প্রবন্ধের একেবারে শেষের দিককার চাঁচাছোলা মন্তব্য। তিনি লিখেছেন, "হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম শ্রেণির উপন্যাসিক নন। ভারততত্ত্ববেত্তা হিসেবেই তাঁর পরিচিতি সর্বপ্রসারী। প্রাচীন ভারতবর্ষের যাপিত জীবন ও আচরিত ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধধর্ম ও জীবনবিষয়ক যে আগ্রহ তাঁর অন্তর্লোকে সঞ্চারিত হয় তারই শিল্পিত স্বাক্ষর কাঞ্চনমালা।"

এ-গ্রাহের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি: প্রেম, মনস্তত্ত্ব ও শিল্প'। প্রবন্ধকার এতে স্পষ্ট করেছেন 'চোখের বালি' রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস রচনা করলেও, সেগুলো ছিল নিছকই বক্ষিমচন্দ্রের 'ঘটনাপ্রধান সমাজসম্যাশ্রয়ী' ধারার অনুবর্তন, শিল্পের সাথে তার কোনো যোগ ছিল না। 'আঁতের কথা' উন্মোচনের বাসনায় মনস্তত্ত্বের প্রলেপ লাগিয়ে তুলির নিখুঁত আঁচড়ে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন চোখের বালিকে। তবে মনস্তত্ত্ব চোখের বালির প্রধান উপজীব্য বিষয় হলেও, মনোচিকিৎসকের 'কেস স্টাডি' যে এই উপন্যাসে আরোপিত হয়ে তার শিল্পহানি ঘটায়নি সোটিও প্রাবন্ধিক নিশ্চিত করেছেন। তিনি উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে ৫টি স্তরে বিন্যস্ত করে এর গঠন-পরিকল্পনা যে আসলে নাট্যাশ্রয়ী সোটির উপরে আলোকপাত করেছেন। আর এই পাঁচটি স্তরেই আমরা দেখি বিনোদিনীর সরব উপস্থিতি। প্রাবন্ধিক লিখেছেন, "বিনোদিনীকে কেন্দ্রে রেখে উপন্যাসিক এ-উপন্যাসের উৎসমুখ যেমন উন্মোচন করেছেন, ঠিক তেমনি করে তুলেছেন বিকশিত ও পরিণামমুখী। উপন্যাসের পরিণাম আর বিনোদিনীর পরিণাম যেন সমান্তরাল ধারানুবর্তী।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা।" রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য নিয়ে গবেষক-সমালোচকরা স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। তাঁরা নিজেদের মতেই থেকেছেন অনড়। সেদিক থেকে গবেষক গিয়াস শামীম অন্যের মতের প্রতিশ্রদ্ধাশীল থেকেও দিতে পেরেছেন মৌলিক ও যৌক্তিক সিদ্ধান্ত। তিনি লিখেছেন, "চোখের বালির ঘটনাংশকে দারুণ ও উপভোগ্য করে তুলেছে একমাত্র মায়ের ঈর্ষা-একথা রবীন্দ্রনাথ বলেননি। এক্ষেত্রে নানা অনুষঙ্গ-প্রসঙ্গ পালন করেছে কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা। মহেন্দ্রের অপরিণামদশী আচরণ, সংসারধর্মে আশার অনভিজ্ঞতা, বিনোদিনীর স্বপ্নাণ উপস্থিতি, বিহারীর শৈত্যস্বভাব প্রভৃতির মিলিত সমবায়ে উপন্যাসে নির্মিত হয়েছে আবেগময় পরিপ্রেক্ষিত; কিন্তু রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষাবিষ সবকিছু ছাপিয়ে উপন্যাসটিকে করে তুলেছে দ্বন্দজটিল, উপভোগ্য ও আকর্ষণীয়।"

তৃতীয় প্রবন্ধ ‘পথের পাঁচালী’ জীবনশিল্পের বয়ান’কে বিখ্যাত উপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী’র পুনর্মূল্যায়ন বলা যেতে পারে। এতে বেশ কিছু নতুন বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন গবেষক। এটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত: বল্লালী-বালাই, আম-আঁটির ভেঁপু, অক্তুর সংবাদ। তিনটি খণ্ডে বাস্তবতার আবেষ্টনী অতিক্রম করে লেখক উপন্যাসটিতে মানুষ ও প্রকৃতির আত্মিক বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। শুধুমাত্র ‘ইড়ঃধহরপদ্ধত ঘড়াবষ’ বলে যে দায় এড়ানো সম্ভব নয় প্রাবন্ধিক সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মত দিয়েছেন। অনেক প্রতিষ্ঠিত সমালোচকই ‘বল্লালী-বালাই’ ও ‘অক্তুর সংবাদের’ অপরিহার্যতা নিয়ে দ্বিদীর্ঘ ছিলেন; এমনকি এই দুই অংশের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। কিন্তু গবেষক গিয়াস শামীমের প্রবন্ধ পাঠ করলে আমরা অবগত হই, ভিট্টোরীয় রীতিতে বিভূতিভূষণ উপন্যাসটি রচনা করলেও, পৌরাণিক আবহ সৃষ্টি করে তিনি এই উপন্যাসটিকে আধুনিকতার স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন। এই দুই রীতি বিভূতিভূষণের হাতে লাভ করেছে অখণ্ড বিভূতি। ফলে খণ্ড দুটো নেহায়েত ফেলনা, বাড়িত অংশ নয়। প্রাবন্ধিক লিখেছেন, “পথের পাঁচালী’র বল্লালী-বালাই, আম-আঁটির ভেঁপু’, অক্তুর সংবাদ নামাঙ্কিত তিনটি অংশের পরম্পরিত গ্রন্থান্য পৌরাণিক সংগঠন সৃষ্টির নিভৃত প্রণোদনা কার্যকর। ‘বল্লালী-বালাই’ ও ‘আম-আঁটির ভেঁপু’র পর ‘অক্তুর সংবাদে’ পৌছলে বিভূতিভূষণের পুরাণলগ্ন অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।” তবে প্রাবন্ধিকের যে দিকটি আমাদের মুঞ্চ করে এবং এই প্রবন্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এর আত্মজৈবনিকতার সমক্ষে অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করা। প্রাবন্ধিক এখানে আঙ্কিক নিয়মেই প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন যে বিভূতিভূষণের শৈলিক সংস্করণই আসলে অপু। এভাবে ছড়িয়ে থাকা সূত্রগুলো একত্র করলে নিতান্ত অর্বাচীন পাঠকও এটির আত্মজৈবনিকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারে। আর এখানেই প্রাবন্ধিকের কৃতিত্ব।

বাংলা সমালোচনা সাহিত্য এখনো যে নিজস্ব ভূমিখণ্ড আবিষ্কারে সমর্থ হয়নি, তার কারণ সবকিছুকে ইজমের ছাঁচে ফেলার অনুবর্তী প্রবণতা। যে কোনো কিছুর উপর ইজম আরোপ করতে পারলে আমাদের সমালোচকরা পরম শ্লাঘা অনুভব করেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য বিচার করার ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় লিবিডোতত্ত্ব কিংবা মার্জাদকে তুলাদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তবে তত্ত্বের ঘেরাটোপে আটকে থাকলেও, মূল বিষয়ে প্রবেশ করা আমাদের ভাগে খুব একটা হয়ে ওঠে না। জনেক মার্জাদী তাত্ত্বিক মন্তব্য করেছেন, “ফ্রয়েড যৌনবিকারগত অসুস্থ মনের পরীক্ষার দ্বারা সমস্ত মানুষের সুস্থ মনের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে তত্ত্ব জাহির করেছেন। এ মনস্তত্ত্ব ভুল হতে বাধ্য।” সুতরাং মার্জাদী বাঙালি চিন্তকদের একটা সাধারণ প্রবণতা হল ফ্রয়েডীয় প্রকল্পকে ভাস্ত, বুর্জোয়া ইত্যাদি তকমা সেঁটে সমাজ-প্রগতির অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা। আবার ক্রান্কফুট স্কুলের কোনো কোনো চিন্তককে দেখা যায় মার্জাদের সঙ্গে ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারার সুচিত্তি সংযুক্তি সাধনে ব্যতিব্যস্ত থাকতে। তত্ত্ব নিয়ে এ ধরনের বিতর্কের জন্য প্রায়শ মূল বিষয়ই থাকে উপেক্ষিত। এগুলো বিবেচনা করে গবেষক গিয়াস শামীম রচনা করেছেন এ-গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধ ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিহ্ন : ইজম নয়, ইমেজ’। ‘চিহ্ন’ উপন্যাসটির বিষয় ভারতবিভাগের অব্যবহিত পূর্বকলীন রাজনৈতিক বাস্তবতা হলেও, এই উপন্যাসে রাজনৈতিক তৎপরতার চেয়ে সংঘশত্তির সক্রিয় উত্থানই মুখ্য হয়ে উঠেছে। একথা অনস্বীকার্য যে, শ্রেণিবিন্দুর কথা এই উপন্যাসে জোরালোভাবে রয়েছে। কিন্তু তাই বলে ঢালাওভাবে এটিকে মাঝ্যিয় তত্ত্বের শিল্পরূপ হিসেবে আখ্যায়িত করা সমর্থন করেন না গবেষক। মানিক তত্ত্বপ্রেমিক নন; আর তাঁর সাহিত্য ‘Propagandish Literature’ নয়। তাই গবেষকের স্থির সিদ্ধান্ত, “মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের বিনষ্টি বিশ্লেষণ করেছেন; সেই সঙ্গে এই বিনষ্টি, পতন ও অবক্ষয়ের নিরাকরণ কাম্য মনে করেছেন। এজন্য তিনি তত্ত্ব থেকে তত্ত্বাত্মরে গেছেন; যে তত্ত্ব জীবনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে না তা ছুঁড়ে ফেলেছেন,

রাজনৈতিক উপন্যাস লিখেছেন, কিন্তু চিহ্নে শেষাবধি কোনো রাজনৈতিক দীক্ষাই বড়ো হয়ে উঠেনি। ১৯৪৫-১৯৪৬ সালের ঘটনা নিয়ে ১৯৪৭-এ তিনি চিহ্ন লিখেছেন, কিন্তু জ্বলন্ত আগনের মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন নিরাসক, নিঃস্পৃহ ও সুস্থির। কোনো মতাদর্শে তিনি শৃঙ্খলিত নন, কোনো একক মতবাদের অনড়-অচল বিন্দুতে তিনি স্থিত থাকেননি। চিহ্ন কোনো ইজম নয়, ইমেজ; সমাজচৈতন্য-পরিস্রূত ব্যক্তিচেতনার চিত্রকল্প।”

সাহিত্য মানবজীবনের সরল অথচ বিপ্রতীপ ঘটনার প্রতিভাস। চলন্ত জীবনের প্রবহমানতা আজকে সাময়িক হলেও, একদিন সেটই ধ্রুপদী বলে পরিগণিত হয়। সাহিত্য চলমান জীবনের সজীব গতিধারা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সময় ও সমাজ - বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো সাহিত্যিকই মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় না। সুতরাং সামাজিক জীবনের পটভূমিতে নতুন মূল্যবোধ ও চিন্তাধারা - উদ্ভৃত বাস্তবতার সরব উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় শিল্পীর রচনায়। ‘সরদার জয়েনউদ্দীনের উপন্যাসে সমাজবাস্তবতা’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে নতুন পরিবর্তনের হাওয়া কীভাবে পুরাতন মূল্যবোধের ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছে তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তিনি লিখেছেন, “বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ছোটগল্পগুলি-প্রকাশনাসূত্রে বাংলা সাহিত্যাঙ্গে সরদার জয়েনউদ্দীনের আত্মপ্রকাশ। এ সময়কালে সংঘটিত বিবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা তাঁর জীবনবোধ ও শিল্পাদর্শকে করেছে গভীরভাবে প্রভাবিত। সমাজ-পরিবর্তনের দীপ্তি-আকাঙ্ক্ষা হয়তো তাঁর ছিলো না, কিন্তু যে-সমস্ত বিষয় সামাজিক শান্তি-স্থিতি-শৃঙ্খলাকে সংহত-সুন্দর অথবা বিনষ্ট করে তা অঙ্কনেও তিনি পরামুখ ছিলেন না। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে লঘু হয়ে তিনি তাই তাঁর উপন্যাসে সমাজজীবনের সে-সব অসঙ্গতি চিত্রিত করেছেন, যা সময়ে-অসময়ে আমাদের অন্তর্জগৎ আলোড়িত করে, বিক্ষিত ও বিপন্ন করে।” সরদার জয়েনউদ্দীন সাতটি উপন্যাস লিখেছেন, ‘আদিগন্ত’, ‘পান্না-মোতি’, ‘নীল রঙ রঞ্জ’, ‘অনেক সুর্যের আশা’, ‘বেগম শেফালী মীর্জা’, ‘শ্রীমতী ক ও খ এবং শ্রীমান তালেব আলি’ এবং ‘বিধবার রোদের টেক্ট’। এগুলোর মধ্যে একদিকে তিনি সমাজ ও সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ অনুসন্ধান করেছেন ; অন্যদিকে সরদার জয়েনউদ্দীনের উপন্যাসে প্রকাশিত সাম্প্রতিক জীবন ও মূল্যবোধের স্বরূপ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা - উত্তরকালের সমাজ - জীবনের বিপর্যস্ত ভাবকে উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

কৃত্য আততায়ীর মতোই কাল বিস্ম্যতির নির্মম ছুরিতে আঘাত হানে আমাদের স্মৃতিসন্তার উপর। বাঙালি সবচেয়ে বিস্ম্যতিপ্রবণ জাতি হিসেবে পরিচিত। হ্রাস্যুন আজাদ তাই মন্তব্য করেছেন, “বাঙালি প্রায়ই আন্দোলন করে, অধিকাংশ সময়ই ব্যর্থ হয়, মাঝে মাঝে সফল হয়; যখন সফল হয়, তখন তারা ভুলে যায় কেন আন্দোলন করেছিল।” কিন্তু এখনো অন্তর্লীন অনুভব ও প্রেরণায় উজ্জ্বল হয়ে আছে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ। তাই বাংলা সাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসে বারবার এসেছে এই প্রসঙ্গটি। মাহমুদুল হকের ‘জীবন আমার বোন’ একটি পাঠকনন্দিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস। ১৯৭১ সালের অগ্নিবারা মার্চের ঘটনাপ্রাবাহ হয়ে উঠেছে এর উপজীব্য। তবে নিরীক্ষা-প্রিয় ঔপন্যাসিক মাহমুদুল হক শৈল্পিক একনিষ্ঠতার দর্শন তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্যেই সন্ধান করেছেন আকাঙ্ক্ষিত মুক্তি। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালিদের জাতিসন্তার উন্মোচনের উজ্জ্বল ও রঞ্জক আলেখ্য ‘জীবন আমার বোন’। আর বাঙালি সেসময় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে দেশমাত্রকাকে মুক্ত করার স্বপ্নের জাল বুনছিল একদিকে, অন্যদিকে নিজেদের করে তুলছিল প্রস্তুত। প্রাবন্ধিক তাই তাঁর প্রবন্ধটির নাম দিয়েছেন, “মাহমুদুল হকের জীবন আমার বোন: মুক্তিযুদ্ধের প্রাকপ্রস্তুতির শিল্পিত আখ্যান।”

এ গ্রন্থের সর্বশেষ প্রবন্ধের নাম ‘বাংলাদেশের উপন্যাসের প্রকরণশৈলী’। শিল্প-সাহিত্যের বাস হল উৎপাদিকা শক্তি আর উৎপাদন সম্পর্কের সম্বন্ধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মূল কাঠামোর উপর দাঁড়ানো উপরিকাঠামোতে। যুগে যুগে মূল কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে, উপরিকাঠামোতে ঘটে নানামাত্রিক পরিবর্তন। আর তার ছাপ পড়ে শিল্প-সাহিত্য। ফলে কালভেদে শিল্প-চরিত্র পরিবর্তিত হয়। এমনকি একই লেখকের বিভিন্ন লেখাতেও কালগত পার্থক্যের জন্য পরিলক্ষিত হয় যুগান্তরের চিহ্ন। সেজন্য উপন্যাসের আঙ্গিক ও প্রকরণশৈলী নিয়ে বারবার নিরীক্ষা হয়েছে এবং কালান্তরের প্রভাবে এভাবেই উপন্যাসে সাধিত হয়েছে জটিলতর রূপান্তর। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়। ভারত-বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানকেন্দ্রিক যে সাহিত্যধারা গড়ে উঠেছে, তাকেই প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিভাগোন্তরকালে বেশ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েই এগিয়েছে বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্য। মাত্র কয়েক দশকের পথ-পরিক্রমায় ভাষা আন্দোলন, আটান্নর সামরিক শাসন, ছয় দফা আন্দোলন, উন্সত্ত্বের গণঅভ্যর্থনা, মহান মুক্তিযুদ্ধ, পঁচাত্তরের পট পরিবর্তন, আবার সামরিক শাসন, নববইয়ের স্বেরাচারবিরোধী আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনাপুঁজি প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছে উপন্যাসিকদের মনোজগৎকে। প্রাবন্ধিক এই উপন্যাসে দুইটি পর্বে বাংলাদেশের উপন্যাসের প্রকরণশৈলী নিয়ে আলোচনা করেছেন। একটি ভারতবিভাগের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ধারা এবং অন্যটি স্বাধীনতা-উন্নত ধারা। প্রথম পর্বে তিনি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আবু ইসহাক, অধৈত মল্লবর্মণ, শওকত ওসমান, শহীদুল্লাহ কায়সার, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সরদার জয়েনউদ্দীন, সত্যেন সেন, জহির রায়হান, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখের উপন্যাস বিশ্লেষণ করেছেন। এগুলো বিশ্লেষণ করে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন: “বিভাগোন্তরকালে বাংলাদেশের উপন্যাসে প্রকরণশৈলী নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তা পরিমাণগত দিক থেকে নিঃসন্দেহে স্বল্প। অধিকাংশ উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত সমগ্র-আয়তনিক কাহিনি; অনুস্ত হয়েছে উনিশ শতকীয় বর্ণনা- বিত্তিধর্মী আঙ্গিক। উপন্যাসে প্রায়শ ব্যবহৃত হয়েছে উপন্যাসিকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ, কখনো কখনো পার্শ্ব চরিত্রের দৃষ্টিকোণ। গতানুগতিক শিল্প-অনুসৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছেন স্বল্পসংখ্যক উপন্যাসিক।” স্বাধীনতা উন্নতরকালের উপন্যাস বিবেচনায় শওকত ওসমান, আবু ইসহাক, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, শওকত আলী, আহমদ ছফা, সৈয়দ শামসুল হক, আখতারজামান ইলিয়াস, রিজিয়া রহমান, সেলিনা হোসেন প্রমুখের উপন্যাসকে গ্রহণ করেছেন প্রাবন্ধিক। খুব বেশি শিল্পমানবিদ্বন্দ্ব উপন্যাস রচিত না হলেও, এই সময়কালে প্রকরণশৈলী ও বিষয়ভাবনায় নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে বলে গবেষক মনে করেন।

গিয়াস শামীম একজন সমাজজনক বুদ্ধিবাদী গদ্যকার। জীবনের সঙ্গে, সমাজের প্রবাহের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে বলেই, তিনি কেবল উপন্যাসের নন্দনতাত্ত্বিক পাঠ গ্রহণ করেই ক্ষান্ত থাকেননি, বরং সেসব উপন্যাসে প্রতিভাসিত সমাজ ও জীবনধারার বিচ্ছিন্ন কথামালাকে সাজিয়ে নিয়েছেন সুরম্য অট্টালিকার মতো। সাহিত্য ও সংস্কৃতি মূল্যায়নের নতুন পরিপ্রেক্ষিত সূজনে তিনি সমর্থ হয়েছেন। স্বচ্ছন্দ, সহজ ও গতিশীল অর্থে গভীর চিন্তা-উদ্দীপক ভাষার মিশ্রিত সমবায়ে রচিত ‘উপন্যাসের শিল্পস্বর’ তাই প্রবন্ধসাহিত্যের প্রথাগত অন্তিক্রান্ত বৃত্ত ভাঙ্গতে সক্ষম হয়েছে। বাচনসর্বস্বতার পরিবর্তে যুক্তি ও মননের বুননে রচনা করায় ‘উপন্যাসের শিল্পস্বর’ লাভ করেছে আকরণস্থের মর্যাদা। সুতরাং এই গ্রন্থটি সাহিত্যমনা পাঠকদের অবশ্যই পাঠ করা উচিত।

যদ্যপি আমার গুরুঃ গুরু শিষ্যের অনন্য আধ্যান

সাইফা শান্তা

বইয়ের নাম: যদ্যপি আমার গুরু

লেখক: আহমদ ছফা

বইয়ের ধরণ: স্মৃতিচারণমূলক উপন্যাস

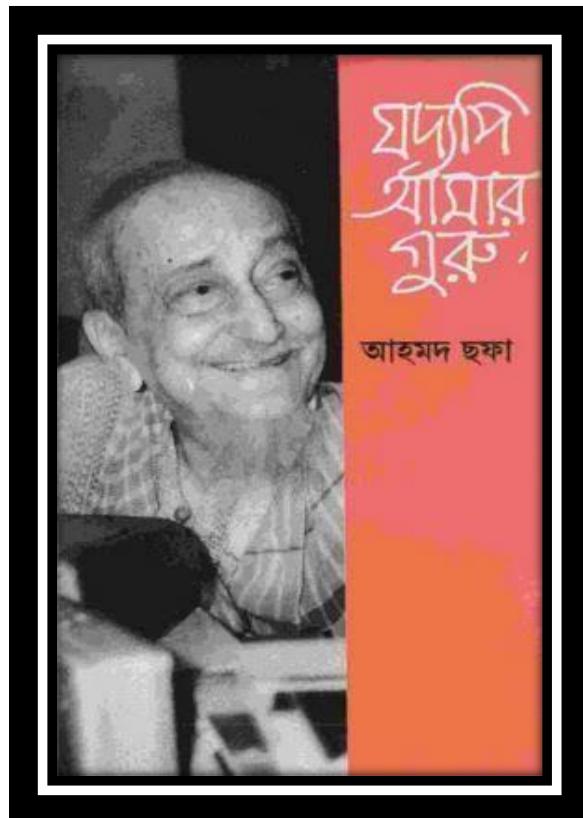
প্রকাশকাল: ১৯৯৮

প্রকাশক: মাওলা ব্রাদার্স,

প্রচ্ছদ: কাইয়ুম চৌধুরী

লেখক পরিচিতি:

আহমদ ছফা ১৯৪৩ সালের ৩০শে জুন চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার হাশিমপুর ইউনিয়নের গাছবাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আহমদ ছফা একজন বাংলাদেশি লেখক, উপন্যাসিক, কবি, চিন্তাবিদ ও গণবুদ্ধিজীবী ছিলেন। আহমদ ছফা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন দীপ্তিময়ভাবে। গল্প, গান, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, অনুবাদ, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনী মিলিয়ে তিরিশটির বেশি বই লিখেছেন তিনি। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বই হিসেবে মুক্তধারা থেকে প্রকাশ পায় ছফার প্রবন্ধগ্রন্থ ‘জাহাত বাংলাদেশ’। সলিমুল্লাহ খান ও আরো অনেকের মতে, আহমদ ছফা বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক। তিনি লেখক শিবির পুরস্কার ও বাংলা একাডেমি কর্তৃক সাদত আলী আখন্দ পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাকে ২০০২ খ্রিস্টাব্দে (মরণোত্তর) একুশে পদক প্রদান করা হয়। ২০০১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে জুলাই অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।



বইটির ধরণ:

যদ্যপি আমার গুরু বইটি আহমদ ছফা রচিত একটি স্মৃতিচারণমূলক উপন্যাস। বইটিকে আহমদ ছফার গুরুদক্ষিণা ও বলা হয়ে থাকে। মূলত আহমদ ছফা কর্তৃক রচিত বইটিতে পুরোটা জুড়েই স্মৃতিচারণের বিষয়টি উঠে এসেছে। দীর্ঘ এক স্মৃতিচারণমূলক রচনাকারে বেশ সুন্দর ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন বাংলাদেশের অগ্রনী চিন্তাবিদ ও কথাসাহিত্যিক আহমদ ছফা। ১৯৯৮ সালে বইটি প্রকাশ হওয়ার আগেই দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় সাহিত্য পাতায় প্রায় চার মাস আগে ধারাবাহিক উপন্যাসটি প্রকাশ পেয়েছে বলে আভাস পাওয়া যায়।

বইটির সংক্ষিপ্তসার:-

“যদ্যপি আমার গুরু গুঁড়ি বাড়ি যায়,
তথাপি তাহার নাম নিত্যানন্দ রায়।”

কথায় আছে, শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। আমি আজ এ কথাটার সাথে দ্বিমত পোষণ করে বললাম, শুরুটা ভালো যার, তখাপি শেষ/সবটাই ভালো তার। মূলত তার দৃষ্টান্ত প্রমাণ হলো ‘যদ্যপি আমার গুরু’ বইটির শুরুর এই প্রথম দু’টি লাইন। এই দু’টি লাইনেই যেন পুরো বইয়ের সারাংশ উঠে এসেছে।

‘যদ্যপি আমার গুরু’ আহমদ ছফা রচিত স্মৃতিচারণমূলক আত্মজীবনী। গুরু ও শিষ্যের যে মিশেল সম্পর্ক বইটিতে স্থান পেয়েছে তা অনন্য সাধারণ। এতো মাঝুকরী ভাষায় বর্ণিত হয়েছে কিভাবে গুরুর কাছে তার শিষ্য প্রতিনিয়ত জ্ঞানপিপাসুর মতো ছুটে আসতো ও প্রশ্ন করে করে জানার আগ্রহ ব্যক্ত করত।

তাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবদন্তি জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের সাথে কথাসাহিত্যিক আহমদ ছফা যারা কি না গুরু ও শিষ্যের ভূমিকায় কথোপকথনের মাধ্যমেই বইটিকে সমন্ব করেছে।

আবদুর রাজ্জাকের নিঃস্বার্থভাবে উপদেশ প্রদান করা ও নিজের জানা বিষয়গুলো অন্যদেরকে জানিয়ে দেওয়া, সুপরামর্শ দিয়ে শিষ্যকে উপযুক্ত গড়ে তোলা, আহমদ ছফা(শিষ্য) রীতিমতো গুরু আবদুর রাজ্জাকের বাসায় এসে সূক্ষ্মভাবে প্রতিটি বিষয় জেনে নেওয়া, এমনকি কৌতুহল নিয়ে বারংবার প্রশ্ন করে উত্তরগুলো মাথায় নিয়ে নেওয়া ইত্যাদি গুরু ও শিষ্যের মধ্যকার আলাপচারিতায় যেন মুখুরিত ছিলো বইটি।

খুব বেশি আকর্ষণীয় দিকগুলো হলো একজন গুরু হয়ে শিষ্যের জন্য আর্থিক, মানসিক ও নৈতিকতার সহিত সাহায্য ও সমর্থন দিয়ে যাওয়া মূলত গুরু আবদুর রাজ্জাকের মতো ব্যক্তিই পারে। সবসময় উচিত -অনুচিত, এমনকি সত্যবাদিতা মেনে গঠনমূলক সমালোচনা করে ভুলগুলো শুধরে দেওয়ার মাধ্যমে গুরু ও শিষ্যের মহানুভবতার পরিচয় মিলেছে।

গুরু মানেই কি ক্লাসে পড়া দেওয়ার পর দায়িত্ব শেষ? শিষ্য মানেই কি জেনো নেওয়ার পর জানা শেষ? জানার কোন সমাপ্তি কি আদৌ আছে? তাহলে ‘যদ্যপি আমার গুরু’ বইটিতে শিক্ষক ও ছাত্রের যে চালচলন, আচার-ব্যবহার, আগ্রহ, সম্পর্ক, জ্ঞান পিপাসু ইত্যাদি দেখে বইটিকে তুলনা করার দুঃসাহস আমার নেই।

নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জ্ঞানী এই গুরু যেভাবে তার শিষ্যকে জ্ঞানত্বণা মিটাতে সহায়তা করেছে তা এই ১১০ পৃষ্ঠার বইটিতে ফুটে উঠেছে।

বইটি কেন পড়া উচিত:

আমরা বই কম-বেশি সবাই পড়ে থাকি। তবে এমন কিছু বই আছে যা তত্ত্ব মিটানোর মতো। যেমন:- আমরা স্বাদযুক্ত জিনিস বেশ পছন্দ করি, অন্যদিকে স্বাদহীন জিনিস এড়িয়ে যাই। তাও ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক সময় খেতে হয়। ঠিক তেমনি কিছু বই থাকে স্বাদযুক্ত। যতোই পড়ি ভালো লাগবে, গভীরে গিয়ে জানার ইচ্ছে থাকবে, কৌতুহলও বেশি থাকবে। অন্যথায় কিছু বইয়ের শুরুতেই আমরা পড়তে অনগ্রহ প্রকাশ করি বা কিংবা অনেক অংশ বাদ দিয়ে, দিয়ে কোনভাবে শেষ করি। “যদ্যপি আমার গুরু” বইটি পড়তে শুরু করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাদ দিতে মন চাহিবে না। এমন একটি শিক্ষণীয়, ও যে যে বিষয়গুলো উপস্থিত তা কখনোই এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়বস্তু নয়। পাঠকদের জ্ঞান ত্বরণ মিটাতে একদম যুগোপযোগী একটা বই। প্রাঞ্জল ও সুন্দর বর্ণনায় পাঠকরা শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যকার সম্পর্কের সমীকরণ উপলব্ধি করতে পারবেন।

গুরুর দৃষ্টান্ত কিছু শিক্ষণীয় উক্তি/মন্তব্য:-

আবদুর রাজ্জাক স্যারের ঢাকাইয়া ভাষায় কথা বলার ধরণগুলো বেশ ভাল লেগেছে বইটিতে। এতো অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করা লোকটাও বাইরে যাওয়ার সময় অন্য উচ্চ শিক্ষিত লোকদের মতো করে কোট-টাই পরিধান না করে পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি পড়ে যেতেন। বইটিতে আবদুর রাজ্জাক স্যারের বেশ কিছু আকর্ষণীয় উক্তি রয়েছে। যা থেকে আমাদেরও শিক্ষা নেওয়ার আছে।

★ একটা কথা খেয়াল রাখন খুব দরকার। যখন কোন নতুন জায়গায় যাইবেন, দুইটা বিষয় পয়লা জানার চেষ্টা করবেন।

- ১) ওই জায়গার মানুষ কি খায়? আর পড়ালেখা কি করে?
 - ২) কাঁচামালের বাজারে যাইবেন, কি খায় এইডা দেখনের লাইগ্যা, আর বইয়ের দোকানে যাইবেন, পড়াশোনা কি করে হেইডা জাননের লাইগ্যা”।
- ★ ‘বড় লেখক এবং বড় মানুষ এক নয়’।
- ★ ‘তরুণ বয়সে মানুষের শরীরের কোন অংশে চেট লাগলে ঘৌবনে সেটা অনুভব করা যায় না অনেক সময়। বুড়ো হলেই ব্যথাটা ফিরে আসে। মানুষের বিশ্বাস এবং সৎকার এগুলো বেশি বয়সে নতুন করে জেগে উঠে’।
- ★ ‘প্রথম লাইব্রেরিতে চুইক্যাই আপনার টপিকের কাছাকাছি যে যে বই পাওন যায় পয়লা একচোটে পইড় ফেলাইবেন। তারপর একটা সময় আইব আপনে নিজেই খুইজ্যা পাইবেন আপনার আগাইবার পথ’।
- ★ ‘লেখার ব্যপারটি অইল পুরুরে ঢিল ছোড়ার মতো ব্যাপার। যতো বড় ঢিল যত জোরে ছুড়বেন পাঠকের মনে তরঙ্গটা ও ততো জোরে উঠব এবং অধিকক্ষণ থাকবো। আর পড়ার কথাটি অইল অন্যরকম। আপনে যখন মনে করলেন, কোন বই পইড়া ফেলাইবেন, নিজেরে জিগাইবেন যে-বইটা পড়ছেন, নিজের ভাষায় বইটা আবার লিখতে পারবেন কি না? আপনের ভাষায় জোড় লেখকের মতো শক্তিশালী না অইতে পারে, আপনার শব্দভাষার সামান্য অইতে পারে। তথাপি যদি মনে মনে আসল জিনিসটা রিপ্রোডিউস না করবার পারেন, ধইরা নিবেন, আপনের পড়া অয় নাই’।

পাঠ-প্রতিক্রিয়া:-

বর্তমানে আমরা বহু ছাত্র-শিক্ষকদেরই দেখি; শিক্ষককে মেনে চলে কজন? আর জানার জন্য বা কয়জন শিক্ষকের বাসায় ছুটে যায়। একটা সুসম্পর্কে গড়ে ওঠা গুরু-শিশ্যের যে মূল্যায়ন তা বিবেককে নাড়া দিতে বাধ্য। বইটি পাঠ করার সময়ে যেন অন্য এক জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ করেছিলাম। গুরু ও শিশ্যের মেলবন্ধনটা এককথায় নজর কাড়ানো ছিলো। পাঠে পেয়েছি একরাশ মুন্ধতা।

গান্ধী

গান্ধী

ঝুঁয়া পাতার অভিজ্ঞানী মন

রাগীব আবিদ রাতুল

কোন এক শীতে অনেক পাতার মত ঘরে পড়েছিল
একটি পাতা। সে ভেবেছিল, এরকম তো অনেক হতে
দেখেছি, কিছুদিন পরে বসন্ত এলেই সব ঠিক হয়ে
যাবে। কিন্তু তা হলো না, বসন্ত এলো, সব পাতাই
আবার নিজের জায়গা দখল করে নিলো, কিন্তু সে
পাতা অবিকল পড়েই রইলো। সে আবার অপেক্ষা
করতে লাগল। বসন্ত ঠিকই আসে, কিন্তু তার জন্য
নয়। সে পড়েই থাকে, তার বুকে সতেজতা
আসে না। তাকে পায়ে মাড়িয়ে বহুজন যাচ্ছে, সে
অবহেলিত ভাবে পড়েই রইলো। মা ঘো মাৰো পাতাটি

ভাবে, সেই হয়ত নতুন একটি গাছ হবে, কিন্তু সে
জানে তা হওয়া সম্ভব নয়, তবুও।

একদিন শীতে হঠাৎ ই অনাকাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি, সে
ভেবেছিল বৃষ্টিও তাকে পাশ কাটিয়ে যাবে। তাই
হচ্ছিল, তবে ভুলক্রমে এক ফোটা বৃষ্টি তার বুক
বরাবর পড়ল। সে অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে
রইলো। পাতটি আবার স্পন্দনা বুনা শুরু করলো, কিন্তু
এবার ও সে বসন্তের ডাক পাবে না। ঘৰা পাতা তবুও
স্পন্দনা দেখে। মিথ্যে জেনেও স্পন্দনা দেখে কেবলই বাঁচার
আকাঙ্ক্ষায়।



কঠুন্ডৰ

পারঙ্গল

রোজ প্রায়ই ওকে দেখতাম জীর্ণ মলিন পোশাকে
কখনো খাবারের দোকান গুলোর সামনে এসে হাত
পাততে কখনো বা ছাতিম গাছটার নিচে বসে
থাকতে। চোখে মুখে থাকতো ওর উদাস ভাব। কখনো
উচ্চস্বরে শব্দ করে হেসে উঠতো কখনো বা কান্না
জুড়ে দিত।

আর আমরা দেখতাম এক পাগলের কান্দ। আবার
কখনো কখনো ওর চোখের কোনায় অশ্রু বিন্দু
চিকচিক চিকচিক করতে দেখতাম।

ও কি তখন কাঁদে?

নাকি মনের অব্যক্ত দুঃখ, ক্ষোভ, ঘৃণা অশ্রুবিন্দু হয়ে
ঝড়ে পড়ছে?

২০-২২ বছরের এই পাগলীকে বেশ অনেকদিন ধরেই
চিনি আমরা। হাতে একটি কাপুড়ের পুঁটলি নিয়ে বেশ
ভীতুভাবে ক্যাম্পাসে সে ধীর গতিতে সতর্ক পানে
হেঁটে চলতো। ওইটুকুই বুঝি ওর সম্বল? আচ্ছা ওর
কি কোন নাম আছে কিংবা কোন পরিচয়?

যাকে নিয়ে এতোসব ভাবনা সেও কি কখনো নিজেকে
নিয়ে ভাববার অবকাশ পেয়েছিল?

সত্যিই তো কি নাম তার? লোকে তাকে পাগল ডাকে
বলেই কি সে পাগল?

মনে পড়ে তার নিজেকে ঘন জঙ্গলের মাঝে
আবিক্ষারের কথা। মায়ের চোখের সেই নিষ্প্রাণ
চাহনির কথা।

মাঝেমাঝে এসব কথা ভেবেই সে নিজের মনে হেসে
ফেলে। আবার যখন পুরনো স্মৃতিগুলো একে একে
উন্মোচিত হতে থাকে চোখের সামনে তখন তার ভীষণ
শব্দ করে কাঁদতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু ওতো সব কিছু সে ভাবতেও পারেনা। মাথা
বড় এলোমেলো হয়ে যায়। তখন সে শুনতে পায় এক
নারীর আর্তনাদ, এক পুরুষ কর্তৃর অশ্রাব্য গালি।
ছোট মেয়েটির ভয়ে ভিতু হয়ে নিরবে অশ্রুবিসর্জন।

মনে পড়ে বাবা নামক মানুষটির বাড়ি ছেড়ে চলে
যাবার কথা। তারপর এক সংগ্রাম ময় জীবনের মুহূর্ত।

আর সমস্ত কষ্ট, যন্ত্রণাকে দূরে ঠেলে একমুঠো আশার
আলোয় মায়ের চোখে জেগে উঠা স্বপ্ন দেখে যে ছোট
মেয়েটি একদিন প্রতিজ্ঞা করে বলেছিল সেই হবে তার
মায়ের স্বপ্ন পূরণের চাবিকাঠি।

কিন্তু তারপরেই স্মৃতিগুলো আবার ঝাপসা হয়ে
আসে। কখনো কখনো লোমহর্ষক স্মৃতিগুলো
অস্পষ্টতার ফালতু আবরণ উপরে ফেলে আরো তীব্র
জ্বালা তৈরি করে দেয় চোখে। তখন সে দেখতে পায়
প্রবল অন্ধকার। যে অন্ধকার তাকে কালো বিষধর
সাপের মতো দংশন করে চলছে ক্রমাগত। সেই ছোট
মেয়েটির ফুঁপিয়ে উঠা আর্তনাদ স্পষ্ট হয়ে প্রবলভাবে
কানে বাজতে থাকে।

মায়ের উৎকর্ষা, সবার দ্বারে দ্বারে ছুটে বেড়ানো।

সেদিন সমস্ত ব্যর্থতার হ্লানি মাথায় নিয়ে যখন মাকে ফিরে আসতে দেখেছিল তখন ওই আঁট বছরের স্বপ্নও বুঝেছিল এই সমাজ তাদের নয়, না এই বয়ে চলা সময়। কিন্তু মাকে সে কি বলে সান্ত্বনা দিবে? মাকে যে সে কথা দিয়েছিল তার স্বপ্ন পূরণ করবে সে। কিন্তু সমাজ? সমাজ কি তা মেনে নিয়েছিল? সমাজ এই ছেট, অসহায় মেয়েটির উচ্চবিলাস দেখে ধিক্কার জানায় নি?

গরীবদের স্বপ্ন দেখতে নেই তা সে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

আজকাল যখন পেটের ভিতর কিছু একটা নড়েচড়ে উঠার অনুভূতি হয় তখনও সে বুঝতে পারে এ সমাজ তার নয়।

তারপরেও আশাহত মা একদিন সখ করে যেমনের নাম রেখেছিল স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন দেখার আগেই সেটা দুঃস্বপ্ন হয়ে এভাবে ঝাড়ে পড়বে আর প্রতিমুহূর্তে তাকে কাটায় বিন্দু করবে সেদিনও কি মা সেটা ভেবেছিল?

আর তাই এই বিন্দু কাটার আঘাত সহ্য করতে না পেরেই হয়তো মা চলে গেল।

আত্মহত্যাটা কি কোন সমাধান ছিল?

স্বপ্ন কেন পারে না? আজ যেমন সে পাগল, তার ভাবনা চিন্তাগুলো যেমন বড় এলোমেলো। অথচ এই এলোমেলোভাবনার ভিতর একটি নতুন ছোট স্বপ্নকে আজকাল বেশ ভালোভাবেই যেন টের পায় সে।

মনে পড়ে মায়ের তীব্র আর্তনাদের কথা, ঝাড়ে পড়া ক্ষেত্রের কথা। বিচার বিচার বলে চিন্কার করে উঠা। কিন্তু মা কি বিচার পেয়েছিল?

মা কতবার বলেছিল

“আমরা কি বিচার পায় না? আমগো জীবন কি জীবন না? বাঁচা থাকনের কি অধিকার নাই?”

অথচ মা কেমন নিজেই চলে গেল।

স্বপ্নের মাথা এখন প্রায় দিনই এলোমেলো থাকে। তখন আর স্মৃতিগুলো স্পষ্ট হয় না কিছুতেই।

কিভাবে যে এই প্রশংস্ত একটা প্রাঙ্গনে নিজেকে আবিক্ষার করেছিল তা সে নিজেও জানে না। মাঝেমাঝে অনেক ছেলে মেয়েদের এক সাথে চিন্কার করে কিছু একটা বলতে শুনা যায়। কিন্তু সেটা যে কি তা তার এই এলোমেলো মাথায় কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু একদিন কানে বেশ স্পষ্টই শুনতে পেয়েছিল বিচার নামক শব্দটাকে।

নিজের অজান্তেই তার শরীর জুড়ে কাঁপুনি উঠলো। ভিতরের কোন এক দৈব শক্তি যেন তাকে বারবার ওই ছেলেমেয়েদের ভীড়ে টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। সারা গা তার শিউরে উঠতো তখন। যে কঠস্বরকে এতোদিন ধরে সে বন্ধ করে রেখেছিল ভয়ে, সেই কঠস্বরই আজকাল কেমন তীর্যক ধ্বনি হয়ে বের হয়ে যেতে চায়।

এখন আর কঠস্বরকে সে দমিয়ে রাখতে পারে না। তার বড় ইচ্ছে করে বড়..

কিন্তু কি যে ইচ্ছে করে তাও সে বুঝে উঠতে পারে না, মাঝাটা ভীষণ এলোমেলো হয়ে যায় আবার।

কখনো রূদ্র দৃষ্টি চোখে আমরা ওকে দেখতাম মিছিলের পানে তাকিয়ে থাকতে গ্রীষ্মের তপ্ত রোদের মতো ওর চোখ থেকে যেন রোদের তীব্র আলোর ঝলকানি স্পষ্ট হয়ে উঠতো তখন।

একদিন আমরা মিছিল নিয়ে সারা ক্যাম্পাস টহল দিছি সেদিন এতোগুলো মানুষের গলার মাঝেও ঠিক যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম একটা ক্লান্ত কঠের প্রতিধ্বনি,
“বিচার, ধর্ষক

বিচার চাই

-চাই

আমার বিচার চা-ই”

তাকিয়ে দেখলাম সবার পিছনের সারিতে দাঁড়িয়ে
আছে সেই পাগলীটি । সবার সাথে গলা মিলিয়ে সেও
গর্জে উঠছে নিজের কষ্টস্বরে আজ কি তবে সে প্রাণ
ফিরে পেল? আজকে কেন যেন ওকে আর পাগল বলে
মনে হলো না । মনে হলো এক প্রতিবাদী নারী । যার
তীব্র কষ্টস্বরে প্রাঙ্গন বারবার কেঁপে উঠতে লাগলো ।

ওর বলা শব্দগুলো অস্পষ্ট, অগোছালো হলেও এই
শব্দগুলোর ভিতর যেন একটা নারীর সারাজীবনের

যন্ত্রণা, ক্ষোভ, ঘৃণা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা বার বার
তীর্যকভাবে ফুটে উঠতে লাগলো ।

ওর কষ্টস্বর যেন তপ্ত আঞ্চন ।



শেষ কয়েকটি ফোঁটা

রিয়াজ উদ্দিন মুন্না

গোরঙানের পশ্চিম পাশে খুঁড়া হচ্ছে সাবিনার কবর। ঠিক আকবর আলীর কবরের উত্তর পাশে। বাপ মেয়ে কাছাকাছি ঘুমাবে। হয়তো দক্ষিণ পাশ থেকে আকবর আলী ডাক দিয়ে জিজেস করবে, “মাতোর কষ্ট হচ্ছে নাতো?”

সাবিনাকে বড় ভালোবাসতো আকবর আলী। চার ছেলের পর এক মেয়ে জন্ম নিলে আকবর আলীর ঘরে তারাদের মাঝে একটা চাঁদ উঠে আসে। সাবিনা যেদিন জন্ম হয় সেদিন আকবর আলী কুড়িল্লার বিলে মাছ ধরে। সেদিন মাছ লাগছিলো অন্য দিনের তুলনায় চেরবেশি। সাথে যে কয়জন ছিল তাদের চেয়ে দ্বিগুণ তিন গুণ করে বেশি হবে। গুণি মিয়া ডাক দিয়ে বলছিলো, “কাইল থেইকা ভাউজের মুখ দেইকা আমু আকবর ভাই, ভাউজের মুখ দেকলে যাত্রা অয় বালা।” শুনে আকবর আলী মিটিমিটি হাসছিলো। বাড়ি ফিরার পথে রাস্তায় পাশের বাড়ির কাশেম এসে পায়ে সালাম করার ভান করে বলল, “এইবার আমার হয়র অয়ছস নডির পুত, তর ঘরে জি অয়ছে।” শুনেই মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেছিলো আকবর আলীর। বিলে এত মাছ পেয়ে আগ থেকেই ফুরফুরে আকবর আলীর মেজাজ। কাশেমকে বলল, “চুদানির পুত, তুই যখন ফইল্লা

হ্যায়ছস তর কাছেই বিয়া দিমু নে। এখন এই মাছটি নিয়া বেইচা আ। আমি বাড়ি যায়।”

সাবিনার বয়স যখন প্রায় আট-দশ বছর তখন সাবিনার ডান চোখে ছানি পড়ে। রূমা, দিপা আর তানজিনার সাথে ‘কয়নার বিয়ে’ খেইলা একদিন বাড়ি ফিরার পর চোখ দিয়ে পানি পড়ছিলো। রূপসী বানু সাবিনাকে জিজেস করছিলো সে কান্না করে কেন। সাবিনা বলছিলো ‘আমা চোখ দিয়া এমনই পানি পড়ে।’ কয়েকদিন ধরে পানি পড়ার পর সাবিনার মাতাকে আকবর আলীকে দেখায়। আকবর আলী বলল, ‘চিষ্টা কইরো না, আমি বেইল্লালা অসুদ লাগায় দিমু নে। আকবর আলী ডাক্তারের ঔষধ বিশ্বাস করে না।’ নিজেই গাছের লতাপাতা ছেঁচে ঔষধ বানায়। কিন্তু এইবারে ঔষধ টি ছিল তার জীবনের শান্তি নিরাময়ের ঔষধ। এ ঔষধ বানানোর পর সারাজীবনের শান্তি প্রতিরোধ করে দেয় হাম টিটেনাসের টিকার মতো।

সাবিনার এখন একটা চোখ নেই। দুইটা পাপড়ি একসাথে মিলে গেছে। এই ডান চোখে তার শেষ দেখা ছিল আকবর আলী একথা কাঠের পিঁড়ি তে পিয়াজে ডিগ ছেঁচতেছে। রূপসী বানু দাঢ়াইয়া আছে পাশে। তারপর সাবিনার চোখ

ফাঁক করে ধরে একটু রস ঢেলে দিল। কি যে ঝাঁজ। মনে হচ্ছিল চোখ বুঝি পুড়ে গেল। তখন শুধু একটা চোখ পুড়েনি। পুড়ে গিয়েছিল তার উচু কপালটাও।

সাবিনা বেড়ে উঠতে লাগলো একটা চাপা স্বভাব নিয়ে। ঘর গুছানো, মাকে রান্নায় সাহায্য করা এসব নিয়ে তার দিন কাটতে লাগলো। বাকি চার ছেলের তুলনায় সাবিনাকে আকবর আলী ডাক খোঁজ করতো বেশি। মেয়েটির জন্য যেমন তার ভালোবাসা বেশি ছিল তেমনি নিজের প্রতি ক্ষোভ ও ছিল বেশি। আকবর আলী পরিশ্রমি মানুষ বলে মন খারাপ ভালো তফাত করতে না পারলেও রূপসী বানু এতটুকু বুবাতো মেয়ের জন্য অনুশোচনা করেই তাঁর মেজাজ খিটখিটে হয়ে থাকতো বেশির ভাগ সময়। কিন্তু সে যতই রেগে থাকতো সাবিনাকে কটু কথা বলতে শুনেনি কেউ।

বয়ঃসন্ধিকাল পেরিয়ে সাবিনা তখন একজন যুবতী নারী। চেহারায়, গড়নে মায়ের মতো রূপসী হলেও একটাই খুদ। যেন দেবী দুর্গাকে ঢেলে রূপ দিতে গিয়ে শিল্পীর ভুল আছড়ে ঢেলে গেছে একটা চোখ। যতই রূপ থাকুক পূজারিন কাছে তার মূল্য নেই। সাবিনার বিয়ে ঠিক করা হলো পতন গ্রামের রফিক ড্রাইভারের সাথে। নিজের বলতে ভিটেমাটি ছাড়া কিছু নেই। যে সি এন জি টা চালিয়ে আয় রোজগার করে সেটি আবার ভাড়ায় চালিত।

রফিকের আগে এক বটে ছিল। একটা বাচ্চা নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়ে আর আসেনি। রফিক ও যায়নি আনতে। কিছু দিনের মধ্যে কাজি অফিস থেকে কাগজ এলো। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিলো দুই বছরের সংসারের।

তবু রফিকের কাছে সাবিনাকে বিয়ে দিতে বিপুল পরিমাণ যৌতুক। আসবাবপত্র ছাড়াও কিনে দিতে তিন লক্ষ টাকায় একটা সি এন জি। বিয়েতে সাবিনার মত ছিল না। যদিও তাঁর মতামত কেউ জিজেস করেনি। নিজ থেকেই বলেছিলো বড় ভাই মন্ত্রিকামৈ। মন্ত্রিকামৈ শুনে অবাক হলেও বলেছিল বোন এখন কিছু করার নেই। আবাবা যা করছে ভালোর জন্যই করছে।

বিয়ের পর দিন যায়। আস্তে আস্তে সাবিনার ভালোবাসা বাঢ়ে। স্বামী যেমন ই হোক তাকে মান্য করা, প্রভুর মতো ভক্তি করা এ শিক্ষা সাবিনার মা চাচিদের চর্চা বহুদিনের। বিয়ের আগে রফিককে অপছন্দের কথা সাবিনার তার ভাবিকে জানালে তাবি বলেছিলো কোন মেয়ে ই তাঁর পছন্দ মতো বিয়ে করতে পারে না। কিন্তু আস্তে আস্তে মানিয়ে নেয়। অপছন্দের পুরুষটি এক সময় হয়ে উঠে প্রভুর মতো। একসময় শাসন করে, একসময় আদর করে।

কিন্তু রফিকের দুইটা কাজ সাবিনা মেনে নিতে পারে না। এক হলো রফিকের ফোনে নানান নাম্বার থেকে কল আসে। সাবিনা ধরতে গেলে প্রচণ্ড গালাগালি করে। গালাগালির ভিতরে রয়েছে দ্বিতীয় কারণটি। প্রথম গালি-ই হয়, 'কানির ঘরের কানি, আমি দেইকা তরে লইয়া খায়, কোন বেড়া থুক্কি ও দিত না'। সাবিনার পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় হয়ে যায়। নিজেকে মনে হয় মেরাসানী বাজারে ম্যাট ম্যাট করা বিড়াল ছানার মতো। যদি মন চায় কারো করণ্ণা দেখিয়ে একটা রুটি বিস্কুট ছুড়ে মারে। এমন অসহায়ের জন্য একটু দরদ ছুড়ে মারলে অপমান বোধের ও কিছু নেই।

রফিককে যত পারে সাহায্য করে আকবর আলী। সবশেষ সৌদি আরবে পাঠানোর ব্যাবস্থা করে রফিককে রফিক সৌদি আরবে গিয়ে ভালো অবস্থায় থাকে। মাসে হাজার তিরিশ রোজকার করে। কিন্তু শঙ্গরের টাকা ফেরত দেয় না। আকবর আলী সাবিনাকে কিছু বলে না। দিনরাত লেগে থাকে রূপসী বানুর সাথে। সাবিনা দেখে নিরবে জল ফেলে। তার তো কিছু করার নেই। রফিকের একটা ফোনের জন্য সাবিনা কত অপেক্ষা করে। কয়েকদিন পর পর কথা হয়। কথায় কোন আদর নেই, কোন মাধুর্য নেই। রফিক কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে দিন দিন।

দের বছর পর ছুটিতে বাড়ি আসে রফিক। রফিক বিদেশ যাওয়ার পর পরই সাবিনার গর্ভপাত হয়। সাবিনা আরো বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এর পর থেকে রফিকের মায়ের আচরণ ও কেমন জানি হয়ে গেছে। মনে হতো সে এ বাড়ির

কেউ না। রফিক আগের চেয়ে মোটাতাজা সুদর্শন পুরুষ হয়েছে। কিন্তু সাবিনা হয়েছে আগের চেয়ে চিকন, রোগা কিসিমের। প্রথম কয়েক দিন বেশ ভালো কাটলেও অন্ধকার নেমে আসে কাল বৈশাখির মতো।

ব্রাক্ষণবাড়িয়া শহরে রফিক একটা ঘর ভাড়া করে। কিন্তু সাবিনাকে সে সেখানে নেয় না। সাবিনাকে বলে সে সেখানে একা থাকবে। কিন্তু সাবিনার আর বুবাতে বাকি থাকে না। মিলন মোল্লা থেকে তাহলে যা শুনেছিল তা সব সত্য। রফিক তাহলে ঘাটুরার এক মেয়ের সাথে পরকীয়া প্রেমে জড়িয়ে আছে বহুদিন থেকে। সাবিনার ভিতরে আগুন জ্বলে উঠে। এ আগুন অভ্যুত কিসিমের। জ্বলবে, কেউ নিভতে সাহায্য করবে না কেউ। জ্বলবে, কোন পুড়া গন্ধ বের হবে না। জ্বলবে, কিন্তু কোথাও কোন ছাই জমবে না। সাবিনার দিন কাটে না, রাত কাটে না। চোখ দিয়ে জল পড়ে। সাবিনা অসুস্থ হয়ে পড়ে। মায়ের কাছে যায়। সেখানে ও একই অবস্থা। তার স্বামী টাকা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানালে তার মায়ের সাথে বাবার চেঁচামেচি চলে দিনরাত।

রফিক ছুটিতে চলে গেছে প্রায় আট মাস। সাবিনার দিন এগুতে থাকে। এবার সে মা হবে। এ সুখের কাছে প্রথিবীর কোন কষ্টই কষ্ট নয়। সাবিনা স্বপ্ন দেখে। সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর ফুফু যদি একজীবন কাটিয়ে দিতে পারে সে পারবে না কেন।

সাবিনা হাসপাতালে ভর্তি। প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে। সাবিনা আইসিইউতে। জ্বান থাকতে একবার ভাবিকে জানাই ছিলো রফিকের সাথে কথা বলবে। মুস্তফার বউ ইমোতে কল করে। কিন্তু রফিক কোন সাড়া দেয়নি। ডাক্তার মুস্তফাকে বলল আপনার বোনের এ রোগ অনেক জটিল। এরিথ্রো গ্লাসটোসিস ফিটালিস। মুস্তফা ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। জিসেস করে এটা আবার কি রোগ ডাক্তার। ডাক্তার মুস্তফাকে বুবিয়ে বলে, “এটা হলো এমন রোগ, যদি স্বামী-স্ত্রী দুজনের রক্ত বিপরীত ধরনের থাকে তাহলে সন্তানের শরীরে রক্ত জমে যায়। তখন, মা শিশু দুজনেই মৃত্যুর ঝুঁকিতে থাকে।”

পাড়ার ছেলেরা কবর খুড়ছে। দেখবাল করছে মুস্তফা নিজেই মলাই মিয়া এসে তাগিদ দিচ্ছে, “জলদি কবর কুড়, জামাইর বাড়ি থেইক্কা লোক আইতাছে লাশ লইয়া যাইতে। হেয়হানে কবর দিতে চাইতাছে হেরো।” মুস্তফা হুক্কার দিয়ে উঠে, “আমার বইন, আমার এলাকায় কবর দিমু, কার কিতা। শহিলো এক ফোড়া রক্ত থাকতে কোন পুতে লাশ নে দেইক্কা ছাড়ুম।” মলাই মিয়া চুপ থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়ে।

আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছে। বৃষ্টি চলে আসবে আসবে বলে। মানুষ গোরস্তানের পশ্চিমের মাঠে জড়ো হয়ছে। জানাজার নামাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করে দাফন করে দিবে। বৃষ্টি চলে আসলে দুইটা মানুষ ও পাওয়া যাবে না। কিন্তু কবর খুঁড়ার কাজ শেষ হয়নি। মুস্তফা এবার নিজে কবরে নেমে আস্তে আস্তে সমান করছে কবরের দেয়াল গুলো। মুরবিরা বার বার তাগিদ দিচ্ছে। কিন্তু কোন কথায় শুনছে না মুস্তফা। উপর থেকে একজন বলছে অনেক সুন্দর হয়তাছে মুস্ত ভাই। এত সুন্দর কবর এ গোরস্তানে বেশি একটা দেখা হয়নি। মুস্তফা নিশ্চাস ফেলে। কবর ছাড়া বোনের কোন কিছু সুন্দর করে দিতে পারেনি সে।

কবরে নিজ হাতে বোনকে শুয়ে দিয়ে উপরে উঠছে মুস্তফা। কয়েকজন দোয়া পড়ছে, বিসমিল্লাহি আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ। কবরের তলায় কয়েকটি ফোঁটা পড়লো মুস্তফার চোখ থেকে। তার মনে পড়লো সাবিনা জানালায় বসে বৃষ্টি দেখার দৃশ্য। মুস্তফা উপরে তাকালো বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়ছে। মুরবিরা তাড়াভংড়া করে কবরে মাটি দিচ্ছে। মুস্তফার ঐ দিকে খেয়াল নেই। ভাবতে লাগলো ভাই হয়ে সাবিনাকে সে কিছু দিতে পারেনি। দিতে পেরেছে কেবল সুন্দর একটা কবর আর বৃষ্টির মতো শেষ কয়েকটি ফোঁটা।

জয়া

প্রদীপ্তি দে চৌধুরী

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

সিএনজিতে উঠতে গিয়েই জয়া খেয়াল করলো,
সিটের একপাশে এক যুবক বসে আছে। উঠবে কিনা
উঠবে না বুবাতে পারলো না, অগত্যা দেরি হয়ে যাচ্ছে
এই দেখে উঠে পড়লো সিএনজিতে।

চালককে বললো, ভাই একটু তাড়াতাড়ি চালান,
আমার একটু কাজ আছে!

সিএনজি চলতে শুরু করে। বাতাসে মুখটা বাড়িয়ে
দেয় জয়া। বাতাসগুলো চোখে মুখে লাগে, আনন্দ হয়
তার। গভীর নিঃশ্বাস ফেলে তাকিয়ে থাকে বাইরের
দিকে!

কিন্তু হৃট করেই আশপাশ থেকে একরাশ ধোঁয়া এসে
যেন জয়ার নাকে মুখে লাগে। কাশতে শুরু করে সে।
দেখতে পায় পাশের যুবক সিগারেট ধরিয়েছে।
অগ্রস্ত অনুভব করলো জয়া। ক্ষণে ক্ষণে ধোঁয়া গুলো
বাতাসে উড়ে তারদিকে চলে আসছে। সে খানিকটা
নিচু কঢ়ে যুবককে বলে, “এক্সকিউজ মি, সিগারেটটা
পিল ফেলে দিবেন? আমার একটু শ্বাসকষ্টের
সমস্যা।”

যুবক তার দিকে নির্বিকার ভঙ্গিতে তাকিয়ে সিগারেটে
ফের আরেকবার টান দিয়ে ভুস করে ছেড়ে দিল
ধোঁয়া। জয়ার কথার তোয়াক্তাই করলো না। বসে
যুবকের ভাবের কোন পরিবর্তন হল না। আরেকবার
ধোঁয়া ছেড়ে একই নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে ওঠে,
“কিরে ভাই আপনারো সমস্যা হচ্ছে? আপনে গাড়ি



থাকল জয়া, খানিকক্ষণ। একটাসময় সত্য সত্য
বিরক্ত লাগতে শুরু করে। চালককে বলে, “ভাই,
উনাকে বলেন সিগারেটটা ফেলে দিতে, আমার সমস্যা
হচ্ছে!”

সিএনজি চালক উপরের আয়নায় তাকিয়ে বলে ওঠে,
“ভাই ফেলে দেন না, কেন এমন করছেন?”

চালান, যার সমস্যা হচ্ছে সে নাকে কাপড় চাপুক না!
তাইলেই তো হয়!”

জয়া বিরক্ত হয়, কিছুক্ষণ পরে সত্য সত্য নাকে কাপড় চাপে। বুঝতে পারে এইধরনের মানুষের সাথে কথা বলে লাভ নেই, ইগনোর করে গেলেই হয়!

গাড়ি চলতে থাকে। রাস্তার উঁচু নিচু খাদে পড়ে গাড়িটা এঁকে বেকে মোড় নেয়। জয়া তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। মৃদু ঝাঁকুনি আর একরাশ ধূলো ধোঁয়ার মধ্যে জয়ার ভাবনাগুলো ধীরে ধীরে বাপসা হয়ে আসে।

এসবেস্টসের ভেতর থেকে সিগারেটের ধোঁয়ার একটা ক্ষীণ রেখা বেরিয়ে আসছে, তারদিকেই তাকিয়ে আছে ছেট্ট জয়া। হঠাৎ ধাক্কা খায়, পাশে বসা চাচাতো বোন সোমা হাসি হাসি মুখ নিয়ে বলে ওঠে, “জয়া বুঝলি, পোড়াবাড়ির ওদিকটায় তোকে এখনো নিয়ে যাইনি। দুপুরে খাওয়ার পর দুজনে মিলে যাবো, ঠিকাছে?”

ছেট্ট জয়া একগাল হাসি দেয়। মাথার ঝুঁটি নাড়িয়ে বলে ওঠে, ঠিকাছে-ঠিকাছে!

জয়া বেড়াতে এসেছে প্রামের বাড়িতে, অনেকদিন পর- একটা বিয়ের উপলক্ষে! সকালবেলা সোমা বলল, চল জয়া আজকে সারাদিন তোকে নিয়ে ঘুরবো। দুজন মিলে বেরিয়ে পড়ে সকাল সকাল, এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরতে থাকে। শহরে বেড়ে ওঠা ছেট্ট জয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে সবকিছু।

নদীপাড়ে আসতেই দেখে ছেট চাচা দাঁড়িয়ে আছেন। চাচা হেসে বলেন, কি রে পিচ্ছির দল, যাবে আমার সাথে নদীর ওপাড়ে?

দুজনই মাথা নাড়ায়। হাসতে হাসতে নৌকায় চড়ে। তাদের হাসি দেখে চাচাও হেসে বলেন, তোদের দেখলেই মনটা ভরে যায় রে! দুজনে ফের হাসে।

মাঝি নৌকা টানে। নদীর ঢেউয়ে নৌকা হেলেদুলে চলে। চাচা বলে ওঠেন, সোমা, তুই না গান শিখছিস, একটা গান ধর তো! সোমা গান ধরে, তার সাথে জয়াও গুনগুন করে। একসময় নদীর পাড়ে নৌকা ঠেকে, নেমে যায় সবাই। চাচা নদীর পাড়েই একটা বাড়িতে নিয়ে যান। তাদের দুজনকে রেখে বলেন, তোমরা এখানে থাকো কিছুসময়। আমি বাজারটা করেই ফিরিছি, কেমন?

দুজন মাথা নাড়ায়।

বাড়িটার সোফায় বসে দুজন গল্প করতে থাকে। দেখতে পায় এক জোয়ান মার্কা লোক তাদের আশেপাশে ঘুরাঘুরি করছে। লোকটা সোমাদের চেনা। তাই তারা দুজন গল্প চালিয়ে যায়।

হৃট করেই তাদের সামনে একসময় এসে যায় লোকটা, সোমাকে বলে, ‘সোমা, তোমার আপু ডাকছে, যাও দেখে আসো তো!’ সোমা যেতে আপত্তি জানায়, সে জয়ার সাথে গল্প করতে চায়। ধমকে ওঠে লোকটি, “মুখে মুখে কথা বল কেন? যা করতে বলেছি করো না!”

সোমা উঠে পড়ে, একসময় চলে যায়। আর সোমা চলে যেতেই লোকটা হৃট করে দরজার সিটকিনি বন্ধ করে দেয়। জয়া কেমন যেন আঁতকে ওঠে; বলে, “ভাইয়া সোমা-সোমা আসবে তো!”

লোকটা বাঁকা হেসে বলে, “আসলে আসবে তো, আসলে নক করবে-খুলে দেবো!”

ছেট জয়া সোফার কিনারে বসে থাকে। লোকটা তার সামনে এসে বলে, “অনেক গরম পড়েছে আজকে, তাই না! এতো গরমে থাকা যায় না”-বলে শার্ট খুলে ফেলে! তার দিকে তাকিয়ে বলে, “চাইলে তুমিও খুলে ফেল না, অনেক গরম তো- আরাম করে বসো!”

জয়া দারূণ অস্পষ্টি বোধ করে। তারপরো ভাবতে থাকে, গ্রামের লোকেরা গরমের সময় এরকম বলে তো- ও কিছু না! এক্ষুণি সোমা চলে আসবে, জয়া তাকিয়ে থাকে দরজার দিকে।

লোকটা জয়ার দিকে তাকিয়ে বুবাতে পারে, সোফায় একদম গা লাগিয়ে বসে বলে, “আরেহ চিন্তা করো না, সোমা চলে আসবে তো!”

জয়া আর থাকতে পারে না। সোফা থেকে উঠে বলে, “দেখি সোমা আসে কিনা।”

লোকটা হঠাত হ্যাচকা টান দিয়ে জয়াকে কোলে বসিয়ে নেয়, তারপরে গালে হাত বুলিয়ে বলতে থাকে, ‘ভাই-ই তো হই তোমার, একটু আদর করি না।’

জয়া শিউরে উঠে। ছেট জয়া বুবাতে পারে, এই আদর ভালো নয়। ছটফট করতে থাকে, একসময় ফাঁক গলে ছাড়া পেয়ে ছুটতে থাকে। কিন্তু একটু যেতেই ধরে ফেলে লোকটা। ধরেই দুহাত দিয়ে কোলে তুলে নিয়ে পাশের বিছানায় ফেলে দেয়! আর তারপরই শক্তনের মতো ঠোট দিয়ে আঘাত করতে থাকে জয়াকে। ছেট জয়া কাতরাতে থাকে, একসময় চিংকার করতে থাকে। লোকটি একহাতে জয়ার মুখ চেপে ধরে, আরেক হাতে হাতদুটো আটকে রাখে। জয়া চোখ বন্ধ করে খোদাকে ডাকতে থাকে, গায়ের জোর দিয়ে ছটফট করতে থাকে। কিন্তু কিছু হয় না, লোকটা অনবরত শরীরজুড়ে মর্দন করেই যায়। একটাসময় জয়ার মুখ থেকে হাত সরে আসে, আর তাতেই সে প্রাণপণে হাত কামড়ে ধরে। লোকটা চেঁচিয়ে ওঠে, সুযোগ পেয়ে যায় জয়া, ছুটে পালিয়ে আসে। কিন্তু দরজার সামনে গিয়ে আর দরজা খুলতে পারে না!

লোকটা ফের এসে ধরে ফেলে। জামাকাপড় খুলে ফেলবার চেষ্টা করে, কাঁধে কামড় বসিয়ে দেয়! জয়া চিংকার করে ওঠে, হাতড়ে হাতড়ে একটা টর্চ খুজে পায়। ওটা দিয়েই সজোরে আঘাত করে পায়ে। লোকটা পিছু হটে পড়ে, জয়া রান্নাঘরের দিকে ছুটে যায়। দেখতে পায় পেছনের দরজা খোলা, জয়া বেরিয়ে পড়ে। মাঠ ঘাট ছুটে পালিয়ে আসে, চিংকার করতে থাকে- করতে থাকে- করতেই থাকে.....

সিএনজি চালক ব্রেক কষলেন। ট্রাফিক জ্যাম শুরু হয়েছে। জয়ার ভাবনা ভাঙ্গে, ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গেছে সে। তার হাত পা কাঁপছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে সে। ছেট জয়ার পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত; চাচাকে দেখতে পায় জয়া, কাঁদতে কাঁদতে সব খুলে বলে। চাচা জয়াকে তাদের ঘরে নিয়ে যান, চাচীকে বলেন। চাচী প্রতিবাদ করতে উদ্যত হন কিন্তু চাচা থামিয়ে দেন! দুজনে মিলে চিন্তা করেন; একসময় ঠিক করেন - চেপে যাওয়াই ভালো! কারণ কোন প্রমাণ নেই, তাছাড়া বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান; এসবের ঝামেলায় পড়তে গেলে গড়গোল না বেঁধে যায়! তারা অবোরে কাঁদতে থাকা ছেট জয়াকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, ‘কিছু হয়নি এগুলো! শান্ত হও, এগুলো কাউকে কিছু বলো না, কেমন? দেখবে একসময় সব ভুলে যাবে।’

ছেট জয়া কাউকে কিছু বলেনি-এমনকি পরিবারকে না- মাকেও না! কিন্তু সে ভুলতেও পারেনি, সেই থেকে পনেরো বছর পরেও না। বড় হওয়ার পর যখন ঠিকঠিকভাবে বুবাতে পারে কি হয়েছে তার সাথে, তখন এই যন্ত্রণা আরো তীব্র হয়ে যায়। প্রতি রাতে যখন নিষ্ক্রিয় বাড়ে, জয়ার ছুট করে মনে হয় পেছন থেকে কেউ এসে তার সারা শরীর কামড়ে দিচ্ছে। গা গুলিয়ে ওঠে তার, ফুপিয়ে কান্না করতে থাকে রাতের পর রাত.....

সিএনজি স্টার্ট হয়, পাশের যুবক আরেকটা সিগারেট ধরে। জয়ার শিরদাঁড়া হঠাতে করে শক্ত হয়ে যায়। তার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিপক্ষে সে কিছুটি করতে পারেনি, সয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। আর কত এভাবে সইবে সে? জয়ার চোখগুলো রক্তিম হয়ে ওঠে, চোয়ালগুলো কামড়াতে থাকে অনবরত। এক গম্ভীর ভরাট কষ্টে সে সিএনজি চালককে বলে, "ভাই আপনি কি লোকটাকে সিএনজি থেকে নামাবেন.... না আমি নেমে পড়বো?"

জয়ার কর্তৃ শুনে ভড়কে যায় দুজনই। যুবকটা সিগারেট ফেলে দেয় সাথে সাথে। কিন্তু সিএনজি চালক গাড়ি সাইড করেন, গাড়ি থেকে নেমে লোকটাকে বলেন, 'এই ভাই, আপনি নামেন! আপনি তো ভয়ানক বাজে লোক, আপুটা বলে যাচ্ছে সিগারেট ফেলবার জন্য- আর আপনি যেন শুনতেছেনই না..!'

যুবক আমতা আমতা করে, আরে, এখন তো ফেলে দিয়েছি!

চালক রেগে যান, 'ফেলেছেন ভালো করেছেন, এখন আপনি নামেন! নামেন বলতেছি, আর যট্টুক আসছেন ভাড়া দেন- একটা কথাও বলবেন না!'

গজগজ করতে করতে চালক বসলেন সিটে, বলতে থাকেন, এগুলো নিয়া ভাইবেন না, বুবালেন আপু! এই ছোকরা গুলা হলো বেয়াদপ, বাপ-মায়ের....

জয়া চোখ বন্ধ করে বুকতরা শ্বাস নিতে থাকে। একসময় গন্তব্য এসে যায়, নেমে পড়ে। ফুটপাত ধরে হাঁটতে থাকে সে। সদ্য বর্ষার বাতাসে তার শাড়ির আঁচল উড়তে থাকে। সেই বাতাসেই অদূরে বসে থাকা বৃক্ষ পরাণ ঘোষের হঠাতই মেয়েটির দিকে চোখ যায়, তিনি তাকিয়ে থাকেন বিস্ময় দৃষ্টিতে। হিজাব শাড়িতে মোড়ানো মেয়েটি তার ভীষণ অপরিচিত, তবু মোটা ফ্রেমের ঘোলা চশমার ওপার থেকে তিনি স্পষ্ট যেন দশভুজাকে দেখতে পান! নিজের অজান্তেই কাঁপা কাঁপা হাতে দুহাত কপালে ঠেকান বৃক্ষ ঘোষ।

হেলেন

সাদিক মাহবুব ইসলাম



ক্রাংকফুট থেকে ছেড়ে আসা লুথফহাসার ডিসি-১০-৩০ বিমানটি করাচির জিনাহ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের রানওয়েতে ল্যান্ড করল। বাতাসে তখন বরফের কুচি ভাসছে। পাকিস্তানের সিঙ্গে এক গোড়াখ পাহাড় ছাড়া বরফ খুব কম জায়গাতেই পড়ে। সেখানে মাইনাস পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা দেখে একটু বিস্মিতই ১৯৭৪ সালের করাচি।

এয়ারপোর্টে ঈগলের মত তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে তাজ খান জতুই। তালঠ্যাঙ্গা এই বালুচের মন-মেজাজ বেশ খারাপ। এই প্লেনে আসছে দুই গান্দার বাঙালি, এই দেশ থেকে নিয়ে যেতে দেশের সবচেয়ে গ্র্যামারাস পপস্টার আর এক লেখিকাকে। আরেহ, হামিদা বানুর মত নালায়েক আওরাতকে নিয়ে যাবি, যা; কিন্তু নূরীকে ফেরত নিয়ে যাবি? নূরীর গান ছাড়া লিলিউডের সিনেমা জমে নাকি? না, মহিলা তাও গোঁধরেছে, সে ‘মাত্ভূমি’তে ফিরবে। আরেহ কী আছে ওখানে? ওখানে ওর গান শুনবে কে, আর সিনেমাই দেখবে কে? এ বছরই তো না খেয়ে মারা গেলে হাজার হাজার মানুষ; এখনো হয়ত দেখা যাবে পথে পড়ে আছে কক্ষালসার মানুষের লাশ।

হ্যাঙ্গারের বাইরে দাঁড়িয়ে হিহি করে কাঁপছে তাজ। সে মনে মনে গালি দিল তার ওপরওয়ালাকে এমন একটা বাজে কাজে তাকে পাঠানোর জন্য। কিন্তু কিছু তো করার নেই। মছুয়া বাঙালির হাতে মার খেয়ে দেশে ফেরা সৈনিকদের একজন সে- এসব ফুটফরমাশের চেয়ে বড় কোনো কাজে তো তাকে পাঠাবে না।

প্লেনের ভেতর নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা গায়ে জ্বালা ধরাচ্ছে আলী আশরাফের গায়ে। পাকিস্তানে যেতে হবে, এটা শুনে রীতিমত মেজাজ চড়ে গেছিল ওর। দশদিন আগে যখন সবকিছু ঠিকঠাক করে ওর হাতে তুলে দিচ্ছিল ফরেন

মিনিস্ট্রির আমলারা, তখন থেকেই ওর বাম পায়ে থেকে থেকে কে যেন গরম ছুরি চেপে ধরছে। তিনবছর আগে পাওয়া ক্ষতগ্লো যেন দাদগে ঘা হয়ে আছে এখনো। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে আসার পথে একটু তন্দ্রামত এসেছিল ওর। একটা তীব্র আর্তনাদ করে তন্দ্রা কেটে গেছিল ওর। ববকাট করা কালো চুলের সুন্দরী এয়ারহোস্টেস ছুটে এসে জিজেস করেছিল কী হয়েছে ওর।

“নাথিং, জাস্ট আ ব্যাড ড্রিম”, চোস্ত জার্মানে দ্রুত ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল সে। ইন ফ্লাইট শেভাল ব্লকে চুমুক দিয়ে মাথাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়েছিল সে।

“আবারো সেই পুরনো দুঃস্ময়, আশরাফ?”

পাশে পাথরের মত বসে একমনে বইয়ের পাতায় চোখ আটকে রেখেছিল শ্যামল বৈদ্য- জঁ পল সার্ত্রের ‘ঘধঁংবধ’ পুরোটা সময় সে অন্য কোনো একটা জায়গায় হারিয়ে গেছিল। শ্যামলকে দোষ দেয় না আশরাফ, সে জানে এই কাজে পাকিস্তানে আসার জন্য রীতিমত পররাষ্ট্র সচিবকে ধরে তদবির করেছে সে। নূরী অথবা বেগম হামিদা বানুকে দেশে ফেরত নিয়ে ওর তেমন কোনো তাগিদ নেই, এটা ওর সাইড মিশন। শ্যামলের প্রধান ইচ্ছেটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

“হ্যাঁ,” আশরাফের সংক্ষিপ্ত উত্তর। শ্যামল আবার বইয়ের পাতায় চোখ রাখল। সাড়ে নয়ঘণ্টার প্লেন জার্নি, এর মাঝে ছয়ঘণ্টাই সে বইয়ের দিকে তাকিয়ে কাটিয়েছে। কিন্তু আশরাফ জানে, সে একটা অক্ষরও পড়েনি। যদি পড়ত তাহলে সে বুঝত, বইয়ের প্রথম লাইনেই ওর নিজের মনের কথাটা লেখা আছে- *Something has happened to me, I can't doubt it any more.*

শ্যামলের মাথায় তখনো ঘুরছে একটা দৃশ্য। সে বসে আছে পদ্মার পাড়ে, হেমন্তের এক মরা বিকেলে। পাশে বসে আছে চিত্রা। চিত্রার এলোচুল উড়েছে প্রমত্তা নদীর হাওয়ায়।

আচ্ছা শ্যামলদা, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?

শ্যামল উত্তর দেবার আগেই বারবার ঘোলা হয়ে যাচ্ছে দৃশ্যটা; প্রতিবার সে চেষ্টা করছে মনে করতে সে কী উত্তর দিয়েছিল- পারছে না। তার মাথায় ঘুরছে শুধু সেই একটা কথা- আচ্ছা শ্যামলদা, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো না?

পাকিস্তানের এয়ারস্পেসে প্রবেশ করার আগে আশরাফ আরেকবার শেভাল ব্লক ১৯৫৪ চেয়ে নিল এয়ারহোস্টেসের কাছ থেকে। শ্যামল বইটা নামিয়ে বলল, “আশরাফ, তোর মাথাটা একদম গেছে।”

“তুই একদম সায়মার মত কথা বলছিস শ্যামল,” আশরাফ মাথা নাড়ল। ওর মনে পড়ল ১৯৫৭ সালে ছেড়ে আসা কলেজজীবনের কথা। ওর পাশের বাসায় থাকতেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক রিডার। তার একমাত্র মেয়ে ছিল সায়মা। কলকাতা থেকে পালিয়ে আসা এক মোহাজের পরিবারের ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে নারাজ ছিলেন ভদ্রলোক। সেকারণে বাড়ি থেকে পালিয়ে ফৌজে ঢুকেছিল আশরাফ। প্রেম বলে কথা, আজো ভুলতে পারেনি সে সায়মাকে। ভুলতে না পারার সবচেয়ে বড় কারণ হয়ত সায়মার সাথে বাঁধের ধারে হাঁটা নয়- ওর নিখর শরীরটা; যেটার সাথে আশরাফের দেখা হয়েছিল বাড়ি থেকে পালানোর আঠারো বছর পরে, এক নামহীন বান্ধারের ভেতর।

“আহ, সায়মা ওর ভালো নিম্নি বানাত রে, একটু কালোজিরা দিয়ে। প্রতিটা নিম্নিতে গুনে গুনে আঠারোটা কালোজিরা থাকত, জানিস?”

আশরাফ শ্যামলের দিকে তাকাল, ওর কটকটে বাদামি চোখের মধ্যে একটা নিরব জিঙ্গসা- কোন আহাম্ক একটা নিম্নিতে কয়টা কালোজিরা আছে সেটা গুনতে যায়?

কিন্তু শ্যামল জানে আঠারোটা কালোজিরার মাহাত্ম্য- আশরাফ বাড়ি ছেড়েছিল আঠারো বছর বয়সে।

একটা গুমোট নৈশব্দ ভেসে বেড়ায় দুই বাল্যবন্ধুর মাঝে। সেটা ভাণ্ডে করাচিতে পৌছানোর ঘোষণা আসার পর।

ডিসি-১০-৩০ প্লেনটার দিকে তাকিয়ে থাকে তাজ খান জতুই। ওর ঠোঁটের ফাঁকে পুড়েছে কে-২ সিগারেট। প্লেন থেকে নামতে থাকা প্রতিটি যাত্রীর দিকে তার চোখ। ওর চোখ আটকে যায় শেষের নেমে আসা দুই যাত্রীর দিকে। একজন মাঝারি উচ্চতার, তার শ্যামলা গায়ের রঙ বলে দিচ্ছে সে মচুয়া বাঙালি। হালকা-পাতলা গড়ন, সপ্তিতভ চলাফেরা। কিন্তু তার পাশের জন রীতিমত এক দানব। নূরী আর হামিদা বানুকে ফিরিয়ে নিতে যদি কুস্তি লড়তে হয়, এই লোক সেটাও পারবে। তবে সৌভাগ্যের কথা, তার হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে তার, বাম পা খোড়া তার।

তাজ খান তার হাতের লিস্টে চোখ বোলাল- এতক্ষণ সে খেয়াল করেনি কাদের রিসিভ করতে এসেছে সে। তার ইউনিফর্মই যথেষ্ট মচুয়াদের বোঝানোর জন্য যে সে তাদের জন্যই এসেছে এখানে।

শ্যামল বৈদ্য- ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক।

কর্নেল আলী আশরাফ মীর- ডিরেক্টরেট অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স বাংলাদেশ।

তাজ খান কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল লিস্টের দিকে। মচুয়াগুলো এ কাদের পাঠিয়েছে? একজন সাংবাদিক আর এক খোড়া কর্নেল? অবশ্য ওদের দেশে খোড়া লোকও কর্নেল হয়- হে হে হে

“আসসালামু আলাইকুম, আমি ক্যাপ্টেন তাজ খান জুই”, তাজ অন্যসময় হলে এতটা পাতা দিত না, কিন্তু ওর চাইতে এক হাত লম্বা আর দুইহাত চওড়া আলী আশরাফকে ঘাটাতে সাহস পেল না। সে উর্দুতে কথা বললেও উত্তরটা এলো ইংরেজিতে।

“আপনাদের এখন আমি নিয়ে যাব করাচি ক্যান্টনমেন্টে, কিছু সাওয়াল করা হবে আপনাদের। আশা করি আপত্তি নেই আপনাদের?”

“আমরা টায়ার্ড। তোমার বস, আইএসআই সেকশন চিফ কর্নেল আসকারিকে বলবে আমি প্যালেস হোটেলে উঠেছি। এসে যেন দেখা করে যায় আমাদের সাথে,” বলে গটগট করে দাঁড়িয়ে থাকা ভুঁতুওয়াগনে উঠে বসল আশরাফ, সাথে সাথে শ্যামল। হা’ করে তাকিয়ে রইল তাজ খান, এতটাই স্তর সে যে বুবতেও পারল না কী হলো এইমাত্র।

গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে পশতুতে বলল আশরাফ, “ডিপো হিল স্টেশন দিয়ে বের হয়ে প্রফেসর গফুর আহমেদ রোড হয়ে গুলশান-ই-ইকবাল হয়ে যাবে প্যালেস হোটেলে।”

এয়ারপোর্ট থেকে যেকোনো সেনাচৌকি এড়িয়ে যাবার এটাই একমাত্র রাস্তা। পাঠান ড্রাইভার নিজের দেশি মানুষ ভেবে গপ্পো জুড়ে দিতে চাওয়ার ইচ্ছেটা বেশ কষ্টে দমন করল।

হোটেলের আসার পথে চারদিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল দুজনই। করাচি ক্যান্টনমেন্টের সামরিক গোয়েন্দা উইং-এ অফিসার-ইন চার্জ ছিল আশরাফের। সেখান থেকে একগাদা ফাইলের ছবি তুলে নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছিল সে একান্তরে। কাজেই ওখানকার সব খবর নথদর্পণে তার।

শ্যামল ছিল দৈনিক সংবাদের এন্টারটেইনমেন্ট জার্নালিস্ট। একত্রিশে মার্চের রাতে সে ছিল সংবাদের অফিসে, সাংবাদিক শহীদ সাবেরের সাথে। রাতে মিলিটারি পত্রিকা অফিসে আগুন ধরিয়ে দিলে সে কোনোমতে জান বাঁচায়, শহীদ সাবের মারা যান আগুনে পুড়ে। এরপর সে সোজা চলে যায় রাজশাহীতে, সেখান থেকে ভারতে। কলকাতায় এসে তার দেখা হয় বাল্যবন্ধু মেজের আলী আশরাফের সাথে-পঁয়ষ্টির যুদ্ধের ওয়ারহিলো। নাম গোপন করে ছদ্মবেশে ছিল সে, কারণ তার কাছে থাকা গোপন সামরিক তথ্য নেবার জন্য ভারতীয়রা ওকে খুঁজছিল। পরে সেক্ষ্টের সাতে মেজের কাজী নুরুজ্জামানের সাথে যুদ্ধ করেছিল দুজনই। স্বাধীন দেশে যুদ্ধাত্ত আশরাফ দায়িত্ব পায় প্রথমে রক্ষীবাহিনীতে, নুরুজ্জামানের সহকারী হিসেবে। পরে সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিএফয়াই গঠিত হলে ১৯৭৩ সালে সে রক্ষীবাহিনী ছেড়ে যায়। ওদিকে শ্যামল দেশে ফিরে দৈনিক সংবাদেই থেকে যায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে। পাকিস্তানি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি আর প্রকাশনার জগতের জালের মত ছড়ানো শ্যামলের নেটওয়ার্ক।

হোটেলে এসে নিজেদের রংমে ঢুকে পড়ল দুজন। শ্যামল চান করতে ওয়াশরংমে ঢোকার পর আশরাফ ব্যাগ থেকে সব জিনিসপত্র বের করল। ব্যাগের ভেতর থেকে বের হলো একটা স্ক্রু-ড্রাইভার। সে স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে রংমের টেলিফোন সেট খুলে তার ভেতর থেকে আড়িপাতার যন্ত্রটি খুলে ফেলল। এরপর ফোন করল করাচি ক্যান্টনমেন্টের কর্নেল আসকারিকে।

“আশরাফ, এসেই তুমি কী শুরু করেছ এসব?”

“আসকারি, আমাদের পিছু পিছু এয়ারপোর্ট থেকে এসেছে একটা সাদা নিশান, নাম্বার ৬২৭৬০। সেটা যেন আমি আমার চোখের সামনে আর না দেখি। হোটেল রিসিপশনের বাদামি স্যুটের পাঞ্জাবি, ছাগলের মত দাঢ়ি আছে যার, তাকেও যেন না দেখি। হোটেলের বাইরে তিনজন টিকিটিকি রেখেছ, সরিয়ে নিও। আর তাজ খান জতুই একটা আন্ত বলদ, ওকে দিয়ে ফরেন ডেলিগেশন এরপরে রিসিভ করতে পাঠিও না।”

“আশরাফ, আশরাফ, দিস ইজ নট ইউর কান্ট্রি এনিমোর। আই হ্যাভ আ জব, ওকে? আমাকে তোমাদের চলাফেরা রিপোর্ট করতে হবে হেডকোয়ার্টারে। নইলে জেনারেল শমশের আমার চামড়া তুলে নেবেন।”

“জেনারেল শমশেরের বিবি বোধহয় জানেন না তিনি জলদস্তের এক বাইজীকে দুসরা শাদি করেছেন। উনার কানে সুখবরটা দিয়ে দেব নি আমি। আর হ্যাঁ, করাচির জিওসি জেনারেল আকবর যে দুবছর ধরে এলএসডি সেবন করছেন, সেটা সম্ভবত তোমাদের নিউজপেপারের প্রথম পেইজে খুব সুন্দর মানাবে।”

“শালা ব্ল্যাকমেলার!”

“ওকে, যা বলার বলেছি। এখন আমাদের অফিশিয়াল ট্রিপের সময় যাচ্ছেতাই করো, সমস্যা নেই। আমার বন্ধু শ্যামল একটা ব্যক্তিগত কাজেও এসেছে এখানে। সেটা করার জন্য মাঝে মাঝে আন-অফিশিয়াল ভিজিটে বের হবো আমরা। তখন কোনো টিকিটিকি আমি দেখতে চাই না, এর কথা কোনো রিপোর্টেও দেখতে চাই না। ওসব দেখলে খুব একটা ভালো হাল করব না আমি তোমাদের করাচি গ্যারিসনের। আর হ্যাঁ, রাতে বেগম বাজারের ঘোড়ির চোলাই দুধ বেচার দোকানটায় এসো ঠিক এগারোটায় যদি দেখা করতে চাও।”

ফোনটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখল আশরাফ। বাইরে ঝিরিঝিরি তুষার পড়ছে। করাচির সবচেয়ে পুরনো হোটেলের কার্নিশে জমছে পেঁজা তুলোর মত তুষার। আশরাফ সেদিকে তাকিয়ে থেকেই হাঁক দিল, “শ্যামল, তোর চান হল? আমি যাব এরপরে, তাড়াতাড়ি বের হ।”

“আসছি!”

মাদি ঘোড়ার চোলাই দুধ মধ্য এশিয়ার লোকের প্রধান পানীয়। হাড়জমানো ঠাণ্ডার মাঝে এ জিনিস পান করে নিজেদের গরম রাখে ওরা। করাচির প্রধান বাজারের এক কোণে ছোট একটা দোকানে এ জিনিস বেচে এক বুড়ো। রাতে ডিনার শেষে আশরাফ চলে গেল সেখানে। আর শ্যামল টেলিফোন ডাইরেক্টের নিয়ে বসল। সে কল করল পাকিস্তানের এক প্রধান কবিকে।

“কমরেড, আছেন কেমন?”

ওপাশের মানুষটি চেনা কঠস্বরে যারপরনাই বিস্মিত হলেন, “ইয়া খুদা, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?”

“না কমরেড, আমি শ্যামল।”

“শ্যামল! তুমি পাকিস্তানে?”

“জি কমরেড,” হাসল শ্যামল, “আজই এলাম। নূরী আর বেগম হামিদা বানুকে দেশে নিয়ে যাব।”

“ওহ, ওরা চলে যাবে তাহলে। ভালোই হবে, মোল্লারা তো হামিদার পেপারের বিরঞ্জে উঠে-পড়ে লেগেছিল। ওকে তো পেপারটাই বেচে দিতে হলো শেষকালে। ও চলে গেলে বড় মন খারাপ হবে।”

“কমরেড, আপনি তো ভুট্টোর কালচারাল অ্যাডভাইজার ছিলেন এডুকেশন আর কালচার মিনিস্ট্রি তে। ছাড়লেন কেন পদ দুইটা?”

“আর বলো না, ভুট্টো বেঙ্গানি করেছে আমাদের চেতনার সাথে। আমাকে ও ওর রক্ষিতা বানাতে চায়। বলে, আমরা পূর্ব পাকিস্তান হারিয়েছি, আমরা ভালো মুসলমান হলে এটা হত না। বলো তো শ্যামল, আমরা বাংলায় কোন কাজটা মুসলমানের মত করেছিলাম? আর হ্যাঁ, শ্যামল, তোমরা এখনো ভুট্টোকে মাথায় তুলে রাখছ দেখলাম। ঢাকায় গিয়ে দেখি এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল পর্যন্ত কয়েক সারি করে মানুষ চিয়ার করছে ওর জন্য। একটা নতুন দেশে এসব কী হচ্ছে?”

১৯৭৪ সালে কবি ঢাকায় এসেছিলেন ভুট্টোর সফরসঙ্গী হয়ে। ভুট্টোর ৫৬ ঘণ্টার সফর তৈরি করেছিল একাধিক বিতর্ক।

“কমরেড, দেশে অনেক কিছুই হচ্ছে। যা হচ্ছে, তা আর বলার মত না। সামনে কি আছে কে জানে!” শ্যামল ধীরে ধীরে আবৃত্তি করল কবির লেখা হাম কে তেহরে আজনাবি কবিতার দুইলাইন-

বসন্তের শ্যামলিমা আবার দেখব কবে দুচোখ ভরে,

আর কত বর্ষা এলে রত্তের দাগ সব যাবে ধুয়ে?

“কমরেড, আপনার সাহায্য দরকার। আমি একজনকে খুঁজতে এসেছি।”

ওপাশের কর্তৃপক্ষের সামান্য কম্পন, “কাকে?”

“আপনি তো জানেন যুদ্ধের পর ৩০-৪০ জন বীরাঙ্গনা চলে এসেছিল পাকিস্তানে, তারা নিজেদের দেশে তাদের সাথে হতে থাকা নিন্দাবাদ নিতে পারে নাই আর। আমি তাদের একজনকে খুঁজতে এসেছি।”

“শ্যামল, তুমি তো বেটা খড়ের গাদায় সুই খুঁজতে এসেছ। এখন কোথা থেকে কীভাবে কাদের খুঁজব?”

“আমার কাছে একটা খবর আছে। আমি যাকে খুঁজছি সে এখানে এসে একটা সেলাই শেখানোর ক্ষুলে কাজ নিয়েছে। এটুকুই জানি। সে নামও পালটে ফেলতে পারে। এখন আমাকে এ তথ্যটা যোগাড় করে দিতে হবে কমরেড- দুইবছর আগে করাচির কোন সেলাই শেখানোর ক্ষুলে ইন্সট্রাকটর হিসেবে একটা বাণিজ মেয়ে কাজ নিয়েছে।”

“শ্যামল, কাজটা কঠিন আর সময়সাপেক্ষ। আমি তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব।”

“থ্যাংক ইউ কমরেড, লাল সালাম।”

ফেনটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখল শ্যামল। পকেট থেকে এক প্যাকেট মার্লবোরো ভার্জিনিয়া বের করল সে। দুই ঠোঁটের মাঝে সেটাকে চেপে ধরে আগুন জ্বালাল সে। দুই টান দিয়ে তার সামনে খোলা ডাইরেক্টরি থেকে আরেকজনের নাম্বার বের করল।

আশরাফ হোটেলে ফিরল রাত দুটোর দিকে। সে এসে শ্যামলকে তখনো টেলিফোন হাতে দেখতে পেল।

কোনো কথা না বলে আশরাফ চলে গেল পুলে, রাতটা সে পুলের পাশে চেয়ারে বসে কাটাবে। শ্যামলকে বিরক্ত করতে ইচ্ছে হচ্ছে না ওর।

জেবুন্নেসা স্ট্রিট, করাচি।

বেগম হামিদা বানু চিনেমাটির নকশাকাটা কাপে সুগন্ধি চা ঢেলে দিলেন আশরাফকে। আশরাফ ধন্যবাদ জানিয়ে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিল। একহারা, ছিপছিপে হামিদা বানু তসলিম সহকারে সোফায় বসলেন। চালিশের একটু বেশি বয়স উনার, মাথার চুলে সামান্য ঝঁপঝোলি ছোপ পড়েছে তার। পাকিস্তানের সবচেয়ে প্রখ্যাত নারীবাদী লেখিকা হামিদা বানু মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যার প্রতিবাদে কলাম লেখায় দু'বছর জেল খেটেছেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি আবিক্ষার করলেন- সবার চোখে তিনি গান্ধার। বাণিজ পরিবারের মেয়ে তিনি, এজন্য তার ‘অপরাধ’ সবার চোখে আরো বেশি পড়ছে।

“আপা, আপনার কলামগুলো পড়তাম আমি যুদ্ধের সময়। আমার কাছে পেপার কাটিৎ এখনো আছে।”

“তাই?” হামিদা বানু একটু অবাক, সেনাবাহিনীর লোক পেপারের কলাম পড়ে এ জিনিসটা তার কাছে নতুন মনে হলো।

“হ্যাঁ,” আশরাফ মুচকি হাসল, “ডেইলি আরশিনামা-এর রোববারের কলামগুলোর কাটিং বিশ পাউন্ড দিয়ে কিনে রেখেছিলাম আমি। জিনিসগুলো দুপ্রাপ্য হয়ে যাচ্ছিল। আমার কাছে রাখা আচ্ছে ওগুলো। ঢাকায় ফিরে একদিন মনে করিয়ে দিয়েন আমাকে, আমার নাখালপাড়ার বাসায় নিয়ে যাব আপনাকে একদিন। আমার বউ, জিনাত আপনার বড় ভন্তে”।

হামিদা বানু অত্যন্ত পুলকিত হলেন এ কথায়, “তাই নাকি? আমি তো ভাবতাম ঢাকায় আমার লেখা কেট তেমন একটা পড়ে না।”

আশরাফ ফিক ফিক করে হাসতে লাগল, “জিনাত তো বাঙালি না আপা; ও কোহাটের মেয়ে, বড় হয়েছে লাহোরে। আমি ওকে চিনেছি যখন আমার পোস্টিং ছিল লাহোরে; ও লাহোর ভার্সিটির অ্যালমা মেটার।”

চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন হামিদা বানু। আশরাফের সাথে আলাপের শুরুতেই জিজেস করেছিলেন তিনি- ওর গ্রামের বাড়ি কই। উত্তরটা কলকাতা শুনে রীতিমত চমকে গেছিলেন তিনি।

আমি মোহাজের, আপা। আমার বাবা মারা গেছিলেন ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-তে। কাকাদের সাথে রাজশাহীতে এসে উঠেছিলাম। আমার মা আবার কিন্তু সিন্ধি; এজন্যই অমন দশাসই চেহারা আমার, হে হে হে

“আচ্ছা, আশরাফ সাহেব,” হামিদা বানু হাত থেকে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে জিজেস করলেন, “আপনি নিজে মোহাজের, আধা সিন্ধি তার ওপরে। আপনার অর্ধাঙ্গী পাঠান। এত মাল্টি-কালচারাল অ্যাটমোফিয়ারের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি আপনার এই ডেডিকেশন কীভাবে জন্মালো? মানে, কারণ কী? আপনার তো বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস থাকার কথা নয়। এরপরেও সবকিছু ছেড়ে বাংলাদেশে গেলেন কেন আপনি?”

আশরাফের হাসিটা চওড়া হলো আরো, “জগতে দুটো ভাগ আছে আপা- জালেম আর মজলুম। আমি মজলুমের পক্ষের লোক। ঠিক যেজন্য আদ্দে মলেরো মুক্তিযুদ্ধ করতে চেয়েছেন, যে কারণে অ্যালেন গিনসবার্গ, কবিতা লিখেছেন, যে কারণে রবিশঙ্কর, হ্যারিসন, বব ডিলান গান গেয়েছে- আমি সেকারণে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করেছি। আর কোনো কারণ নেই।”

খেয়াবান-ই-রঞ্জি স্ট্রিট, ক্লিফটন, করাচি।

করাচির সবচেয়ে অভিজাত এলাকা ক্লিফটন। বিদেশি দৃতাবাস, উন্নত যোগাযোগব্যবস্থা, সচ্চল বাসিন্দা- একটা পুরোপুরি উন্নত, সমৃদ্ধ এলাকা এই ক্লিফটন। পপ-তারকা নূরীর বাড়ির সামনে এসে থামল একটা কালো ভৱ্রওয়াগন। ড্রাইভওয়েতে একটা রংপোলি মার্সিডিজ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে যারপরনাই খুশি হলো শ্যামল- এই গাড়ির মালিককে সে বিলকুল চেনে। ঝার্ণা, ললিউডের সবচেয়ে আকর্ষণীয় চিত্রনায়িকা। ইনিও বাঙালি। যাহ, দুজনকেই একসাথে পাওয়া গেল। অনেকদিন দেখা হয়নি এদের সাথে।

ওকে দেখে দৌড়ে এসে নূরী জড়িয়ে ধরল। সোফায় বসে বসে আড়ডা দিচ্ছিলেন ঝার্ণা, তিনি উঠে এসে বললেন, “শ্যামলদা করাচি এলে কবে? আর তুমি অমন শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেলে কীভাবে?”

“এইতো কালকেই এলাম,” মৌজ করে সোফায় বসে সিগারেট ধরাল শ্যামল, “তা অ্যাদিন পর দেখা। তোমরা আছ কেমন সবাই?”

নূরী হাসতে হাসতে বলল, “এতক্ষণ চিন্তায় ছিলাম। এইতো দুদিন আগে এলেও দেখতে পেতে আমার বাড়ির সামনে মানুষের জটলা- সবার এক কথা, যেতে দেব না। এখন তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, আটঘাট বেধেই এসেছ। আমার আর চিন্তা না করলেও হবে। নিশ্চিন্তে দেশে ফিরতে পারব।”

“তা আর বলতে!” নিজের সাইডব্যাগ থেকে এক তাঢ়া ফাইল বের করল শ্যামল, “তোমার কন্ট্রাক্টের কাগজ। এসব সাইন করে দিলেই তুমি মুক্ত। এরপর আর দুদিন লাগবে সব গোছাতে। সামনের শুক্রবার রাত তেহরানের ফ্লাইট। তেহরান থেকে দেশে ফিরব আমরা।”

“কেন? আমি তো শুনেছিলাম করাচি টু ঢাকা প্লেন চালু হয়েছে। তা তেহরান ঘুরে যাব কেন?”

“কারণ আমরা পিআইএকে ঠিক ট্রাস্ট করিনা। এক্সট্রা খরচ যা হবে, সেটা স্পন্সর করার মানুষ আছে।”

ঝর্ণা ছলছল চোখে তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে। তিনিও দেশে ফিরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পাকিস্তান সরকার আটকে দিয়েছে তার পাসপোর্ট। ঝর্ণা ললিউডের প্রাণ- তার ওপর কোটি কোটি রুপি ইনভেস্ট করে রেখেছে পাকিস্তানের প্রযোজকরা। এজন্য তাকে ফিরতে দেবে না পাকিস্তান। নূরীকে নিয়েও কম কার্তখড় পোড়াতে হয়নি। মুফতে সুযোগ বুঝো বড় বড় টোপ দিয়েছিল বলিউডের হোমড্রাচোমড্রাও। এই গোটা উপমহাদেশের অন্যতম পপতারকা নূরী, ওকে নিতে পারলে বিরাট লাভ হবে সবারই। শেষ পর্যন্ত রেখে যেতে হবে ঝর্ণাকেই। শ্যামলের ইচ্ছে হলো, ঝর্ণাকে লুকিয়ে পাচার করতে বাংলাদেশে। আশরাফ ঝানু গুপ্তচর, সে নিশ্চয়ই পারত এমন কিছু করতে। কিন্তু বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষও এই আপোষরফা মেনে নিয়েছে, এমন সময়ে ঝর্ণাকে নিয়ে উপরি ঝামেলা বাধানোর কোনো মানে হয় না।

ঝর্ণার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল শ্যামল। সে জানে ঝর্ণা এখানে বাংলাদেশের চাইতেও আরামে থাকবে। কিন্তু খাঁচার সুখ দেখিয়ে কি আর বনের পাথিকে মানানো যায়?

“শ্যামলদা, তুমি আমাকে যে কাজটা করতে বলেছিলে,” শ্যামলের জন্য পেন্ট্রি প্লেটে তুলে দিতে দিতে বলল ঝর্ণা, “আমি খোঁজ নিয়েছি। করাচির সব সেলাই শেখার স্কুলে এই খবরটা নেয়ার জন্য আমি আমার এজেন্টকে বলেছিলাম। সে আমাকে একটা লিস্ট দিয়েছে।”

শ্যামল নড়েচড়ে বসল কফির মগ হাতে। নূরীর হাউজকিপারের বানানো ব্ল্যাক কফির সুখ্যাতিতে তামাম করাচি মশহুর।

“মোটমাট বারোজনের নাম এসেছে আমার কাছে। এর মধ্যে তুমি যে স্পেসিফিক ডেক্সিপশন দিয়েছিলে- সেটা মিলেছে একজনের সাথে।”

হ্যাঁ, চিরার একটা বর্ণনা ফোনে দিয়েছিল শ্যামল- পটলচেরা চোখ, মেদহীন ছিপছিপে শরীর, লম্বা কালো চুল, তামাটে ফর্সা গাত্রবর্ণ আর ঠোঁটের ওপর একটা তিল, মেরিলিন মনরোর মত। শ্যামল ওকে ডাকত পদ্মাপাড়ের মনরো বলে।

“মেরেটার নাম আসমা। বাহাতুরে এসেছে করাচিতে। মুসা কলোনিতে থাকে এক বৃন্দাব পরিচারিকা হিসেবে, পাশাপাশি সেলাই স্কুলে কাজ শেখায়। এক্সিলেন্ট কাজ করে নাকি সেই মেয়ে। বেশ পরিচিত মুখ মুসা কলোনিতে; কিন্তু কোনো পুরুষকে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। আর একটা গুজব তো আছে, সে নাকি যুদ্ধের সময় কোন ব্রিগেডিয়ারেৰ্ৰ”

হাত তুলে ঝর্ণাকে থামিয়ে দিল শ্যামল, বাকিটা শুনতে চায় না সে আর।

“ঠিকানাটা দাও তো আমাকে, ঝর্ণা। আমি যাব।”

একটা কাগজ শ্যামলকে দেয় ঝর্ণা, শ্যামল উঠে যায়। ঝর্ণার বেড়ে দেয়া পেস্ট্রি অবহেলায় পড়ে থাকে প্লেটে।

শ্যামল বসে আছে হোটেলের রংমে। আশরাফ এসে দেখল, শ্যামল স্তুক্র হয়ে আছে, ওর মুখে জমেছে ঘনকালো মেঘ। নীলচে ধোঁয়া ওর মাথার চারপাশে তৈরি করেছে এক অতিপ্রাকৃতিক আবহ। কটা সিগারেট পুড়িয়েছে শালা যে এত ধোঁয়া হয়েছে? শ্যামলের ক্লিনশেভ চোয়াল ঝুলে আছে দুশ্চিন্তায়।

“শ্যামল, ক্লিফটনে কিছু হয়েছে?” আশরাফ গিনিজ বিয়ারের ক্যান খুলতে খুলতে প্রশ্ন করল, “কিছু হয়েছে নূরীর?”

“না।”

“তাহলে?”

শ্যামল সিগারেটের গোড়া অ্যাশট্রেতে সজোরে চেপে ধরে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। আশরাফের সামনে এসে বলল, “একটা প্রশ্নের উত্তর দে আমাকে আশরাফ। তুই আমি যুদ্ধ করেছি, করিনি?”

“করেছি,” আশরাফ চাঁচ করে বুঁকে উঠতে পারেনা শ্যামলের হঠাতে কী হয়েছে, “কেন? এই প্রশ্ন কেন করছিস তুই?”

“দেখ, তুই আমি খেতাব পেয়েছি, স্বাধীন দেশে চাকরি পেয়েছি, পাইনি?”

আশরাফ সহসা বুঁকে যায় শ্যামল কেন এসব প্রশ্ন করছে। ওর চোয়াল শক্ত হয়ে যায় মুহূর্তেই।

“যুদ্ধে হারলে তোর কী হত? ফায়ারিং ক্ষোয়াড নয়তো নির্বাসন। আমার কী হত? নির্বাসন। স্বাধীনতা আমাদের জীবন দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে, একটা ব্ল্যাক চেক দিয়েছে যেটা ভাঙিয়ে খাচ্ছি আমরা”

“শ্যামল! কী বলছিস তুই এসব?”

“না, আমাকে বলতে দে। হ্যাঁ, আমরা কিছুর জন্য যুদ্ধ করিনি। আমরা লড়াই করেছি। কিন্তু চিত্রা, চিত্রার কী দোষ? মাসের পর মাস ওকে ছিঁড়ে খেয়েছে পাকি বাঞ্ছেতের দল। এরপর স্বাধীনতা এলো, বাঙ্কার থেকে উদ্ধার করা হল ওকে- অর্ধনগ্ন, অর্ধমৃত। তখন সবাই ওকে ছি ছি করছিল। রাস্তার টোকাই পর্যন্ত ওকে বলছিল- বেবুশ্যা মাগী। কেন? এই যে তুই, এক পা খোঁড়া। কেউ তোকে বলেছে খোঁড়া হারামজাদা? তাহলে ওকে কেন বলছিল সবাই এসব?”

আশরাফ মাথা নাড়ল, “দেখ শ্যামল এসব বলে তো লাভ নেই”

“না, থাম তুই। আরো আছে। ওকে ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। ওই টাকায় বাড়ি তুলেছে ওর বাবা। কিন্তু সে বাড়িতে জায়গা হয়নি ওর। কেন? কারণ লোকে মন্দ বলবে, ওর বোনের বিয়ে হবে না। কেন? ওর সম্মানের বিনিময়ে পাওয়া বাড়িতে ওর কেন জায়গা হলো না?”

“উত্তরটা আমার কাছে চেয়ে কোনো লাভ আছে?”

আশরাফ নিজের অস্বত্তি ঢাকতে বিয়ারের ক্যানে চুমুক দিতে যায়, শ্যামল এক থাবা মেরে ফেলে দেয় সেটা ওর হাত থেকে।

“হ্যাঁ, উত্তর দিবি তুই। উত্তর দিব আমি। কারণ আমরা ওর মত দুই লাখ নারীর ইজ্জত ক্যাশ করে স্বাধীনতা পেয়েছি। শহিদেরা শহিদ, আমরা গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা, আর ওরা? বীরাঙ্গনা। এর মানে সমাজ কী বোবো? বোবো একদল বোবো, যারা মরতে পারেনি, গলায় দড়ি দিতে পারেনি। বেহায়ার মত চেহারা দেখিয়ে বেড়াচ্ছে সমাজের বুকে। বল তো, ওদের কী দোষ ছিল?”

শ্যামল হ্রস্ব করে কাঁদতে শুরু করল। আশরাফ ওকে জড়িয়ে ধরল, ওর মনে পড়ল ও না থাকলে জিনাতের কী হত যুদ্ধের শেষে।

সায়মার কপালে যা হয়েছে, ঠিক তা-ই হত।

“চিত্রা আমাকে বলেছে, সে আমাদের সবাইকে করঞ্চা করে। করঞ্চা করে আমাদের মেরুদণ্ড না থাকাকে। আমাকে সে চলে যেতে বলেছে, আশরাফ। বলেছে, ওর প্রশ্নের দিতে না পারলে ওর সামনে যেন না যাই আর।”

আশরাফ চুপ করে থাকে। ওর মুখে আর কোনো উত্তর যোগায় না।

যুদ্ধটা সব কেড়ে নিল, শুধু ওদের কষ্টগুলো নিয়ে গেল না।

(গল্পটি কয়েকটি সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে লিখিত। চিত্রা চরিত্রটি নীলিমা ইব্রাহিমের ‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি’ বইয়ের দুই বীরাঙ্গনা রীনা এবং তারা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় লিখিত।

নূরী চরিত্রটি রূনা লায়লা এবং ঝর্ণা চরিত্রটি চিত্রনায়িকা শবনমের ছায়া অবলম্বনে লিখিত। ১৯৭৪ সালে রূনা লায়না বাংলাদেশের ফিরে আসেন নানা প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে। পাকিস্তানের চিত্রনায়িকা শবনমের পাসপোর্ট আটকে দিয়েছিল পাকিস্তান সরকার। তিনি দেশে ফিরে আসেন ১৯৯৯ সালে।

কমরেড ফয়েজ আহমদ ফয়েজের বাস্তব কিছু ঘটনা তুলে আনা হয়েছে এখানে। পাকিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই কবি ভুট্টো সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন ১৯৭২-১৯৭৪ সালে। গল্পে উল্লেখিত কবিতার পঙ্কজিদুটো তিনি ১৯৭৪ সালে ঢাকায় এসে লিখেছিলেন। বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া গণহত্যার বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিলেন তিনি। জহির রায়হানের ‘স্টপ জেনোসাইট’ এর ইংরেজি চিত্রনাট্য তার লেখার কথা ছিল।

বেগম হামিদা বানুর চরিত্রটি পাঞ্জাবি কবি আহমদ সালিম ও পাকিস্তানি লেখিকা জেবুন্নেসা হামিদের ছায়ায় লিখিত। কবি আহমদ সালিম ছিলেন প্রখ্যাত পাকিস্তানি কবি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলায় কারাগারে যেতে হয়েছিল তাকে। পাকিস্তানের সবচেয়ে প্রখ্যাত নারীবাদী লেখিকা জেবুন্নেসা হামিদও বাঙালি ছিলেন। দুঃখজনক হলেও বাংলাদেশে ফিরে আসার কোনো ইচ্ছে তার ছিল না, স্বাধীনতার পক্ষেও তিনি কাজ করেন নি।)

দায়

মাহমুদ আব্দুল্লাহ

‘উই আর স্যরি!’

সাদা এপ্রন পরিহিত ডাক্তার ভদ্রমহিলার কথা শুনে চমকে উঠলেন আবরার সাহেব। ভাবনার সুতোগুলো আচমকা কেটে যাওয়াতে খানিকটা বিচলিত হলেন যেন। হাওয়ায় উড়ে যাওয়ার আগেই সেসব কজা করার একটি ভঙ্গি ফুটে উঠল তার মুখে চোখে।

-কিছুই করতে পারলেন না?

-তেমন কিছু করবার সুযোগ যে ছিল না সেটা তো আগেই বলেছি।

আবরার সাহেবে কিছুই বললেন না, কিংবা খুঁজে পেলেন না হয়ত। নির্ণিষ্ট শুন্য দৃষ্টি মেলে দিলেন ততোধিক শুন্য আকাশের দিকে। ডিসেম্বরের কনকনে শীতের এই রাতে তেমন কেউ আর নেই বাইরে। খাটো লাঠি হাতে উর্দ্ধপরা দারোয়ান হঠাত হাঁকল তীক্ষ্ণ ঝঁইশেল। তার নীল চেয়ারের নিচে সাদাকালো বেড়ালটি একটু নড়ে উঠল শুধু, আবার সব নিশুপ। ইমার্জেন্সীর সাততাড়াতাড়ি হটগোলের মাঝথেকে নিজেকে আলগোছে বিযুক্ত করে নিলেন। বাইরে ঘন কুয়াশা, এলোমেলো বাতাস। শীতের বারাপাতা একটি দুটি করে নেমে আসছে এই ধূসর রাতের জামিনে। সদর দরজার ফাক গলে বাইরে তাকাতেই আবরার সাহেব হেঁটে যেতে দেখলেন নিজের তারুণ্যকে।

এই হাসপাতালের দরজা পেরিয়ে সোদিন চুকেছিল বিরাট শহরে একা এই তরুণ। কাঁধে তার বোলান ব্যাগ, তাতে উপজেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল রিপোর্ট, সরকারি হাসপাতালের কেনা অযুধ আর প্রিয় একটি বই। সামনে ট্রেচারে শুয়ে মরণাপন্ন মা। পায়ে পায়ে হেঁটে সদা অসুবিধাকী এই হাসপাতালে চুকে গিয়েছিল বছরবাইশের সেই সদ্য তরুণ। একবুক আশা আর প্রবল আকাংখায় সে ছুটে বেড়িয়েছিল সে। ডাক্তার, ল্যাব-রিপোর্ট আর বিলভাউচারের ব্যস্ততাময় দিনগুলি কেটে গিয়েছিল খুব দ্রুত। মায়ের জীবনীশক্তি যত কমছিল তার সাথে পান্না দিয়ে কমছিল সেই তরুণের আশা আর সামর্থ। রোগ শোক আর সন্তাপে ভরা দুঃখময় সেই দিনগুলো যখন ফুরিয়ে যেত, চেয়ারে বসে আনমনে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকত তরুণ। সাদা ফ্লুরোসেন্ট বাতিগুলো একে একে নিভে যাচ্ছে, আর একেকটি জায়গা চেকে যাচ্ছে আঁধারে। তারপর আরও একটি, আরও একটি। ছোট ছোট আলোর উৎসগুলো নিভে গিয়ে যেন নতুন আলোর জানলা খুলে দিতো রোগিদের সামনে। কাছে দূরে এখান ওখান হতে ভেসে আসত বিপন্ন আর্তনাদ। একা জেগে থাকা তরুণের মাথার ওপর একটি বাতি জ্বলত কেবল। চারদিকে ঘিরে থাকা আঁধারে একমাত্র আলোর দ্বীপ যেন এটি। যে রাতে কোন কারণে নিভে গেল সেই বাতিটি, সে রাতেই মারা গেলেন মা। ভীত সন্ত্রিপ্ত তরুণ হাতড়ে হাতড়ে যতই এগোয় সুইচবোর্ডের দিকে, কোন এক দুর্ভেদ্য দেয়াল আড়াল হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তার সামনে। হাতবাড়ানো দূরত্তের সুইচবোর্ড ধীরে ধীরে আবছা হতে থাকে। চারদিক থেকে ক্রমে ঘন হয়ে আসে আঁধার, আরও ঘন। একসময় নিকব কালো অন্ধকারে চেকে যায় চারপাশ। সেই ভয়ানক কালো কালিতে ডুবে যেতে যেতে তরুণ শোনে হাকডাক চিঢ়কার, স্ট্রেচারের শব্দ, একসময় দূরে মিলিয়ে যায় তাও...চা খাবেন স্যার, কড়া লিকারের চা।

এই শীতের রাতে ব্রিক সয়লিং করা রাস্তায় চপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কাছে এসেছে চা-ওয়ালা। শীতের রাতে বাড়তি কামাই তো এরাই। ছেঁড়াভাবনার সুতো খোঁজবার মত আবারও শুন্যে চেয়ে থাকেন আবরার সাহেব। অমন নিষ্পন্দ চেহারা দেখে চা-ওয়ালা বেচারারও সন্দেহ হয়, আদৌ লোকটি দেখেছে কি? নিজের উপস্থিতি জানান দিতে আবারও লম্বা সাদা ফ্লাক্সটায় চাপড় দেয় সে, “ভালা লিকারের রং চা আছে স্যার, সাথে টোস্ট।”

এবার যেন নজরে পড়ে আবরার সাহেবের, “শুধু এককাপ চা-ই দাও, আদা আছে তো?”

সন্ধ্যা থেকে কুয়াশা জমে জমে স্যাতস্যাতে করে দিয়েছে সিমেন্টের বেঞ্চিটাকে। খুঁজে পেতে শুকনো জায়গায় বসে হাতে নেন চায়ের কাপ। পাতলা কাগজের আবরণ ভেদ করে হালকা আঁচ লাগে হাতে। জমে আসা ঠাণ্ডায় ধীরে ধীরে ধোঁয়াগুলো উড়ে আসে চশমার কাচের দিকে। আলতো চুমুকের ফাকে ঘোলা করে দেয় সোনালী ফ্রেমে ঘেরা প্লাস দুটো। খানিকদূরের শিউলি গাছটা আরও একটু দূরে চলে যায়। ঘোলা হয়ে ওঠে ভাংতি টাকা হাতে বৃন্দ চা-ওয়ালা। লনের ঘাস-পাতা, বিড়াল, ভুইশেল সব ধীরে ধীরে ঘোলা হয়ে যায়। সেই আবছা আবছা নেই নেই দৃশ্যে দ্রুত দৃশ্যান্তের ঘটে। দেখা যায় একটি গ্রামীণ মেঠো পথ, বিরাট ব্যাগ কাঁধে এক হতাশ তরুণ। যেন পৃথিবীর ভারে ন্যূজ দেহখানি বহু ক্লেশে সে টেনে নিয়ে চলেছে কোথায়। পথের ধারের শিরীষ গাছের সারি নকশীকাটা ছায়া ফেলে তার ব্যাগে শরীরে। পথের শেষ মোড়টিতে এসে মাথা তুলে দূরে দৃষ্টি দেয়, গ্রামের শেষ বাড়িটির আভাস দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। সীমানার বাইরে বুড়ো কড়ইগাছটির তলায় যে বারোয়ারি কবরস্তান, তার খসেপড়া শ্যাওলাধরা দেয়ালও নজরে পড়ে। তরুণটি তার লম্বা ঘাড় আরেকটু লম্বা করে দেখতে চায় নতুন কবরটি, যার মাটি সে স্যাত্তে তুলে দিয়েছে গত পরশু।

বাবা ছিল না, ছিল মা আর সামান্য কিছু জমিজিরেত। মায়ের অসুখের ফাঁকে সব কেমন নেই হয়ে গেল। এই বিরাট গ্রামটিতে তার নিজস্ব জায়গা বলতে আছে সেই কড়ই তলার সাড়ে তিনহাত জমি। অত্তুকুই টান, সেটুকুই স্মৃতি। এই সারিবন্ধ শিরীষগাছের তলায় সেই টানটুকু বড় কঠিন হয়ে বাজছে হৃদয়ে। অক্ষম অসহায় ভারী হাতে সে দূরে সরিয়ে রাখে সেই পিছুটান। ধীরপদে সে এগিয়ে যায় পৃথিবীর পথে। তাকে বেঁচে থাকতে হবে, টিকে থাকতে হবে সদা উদ্যতগ্রাস পৃথিবীর বিস্মৃতির মুখগহর থেকে।

দূরপাল্লার বাসে বাকুনি খেতে খেতে তরুণ বসে বসে ভাবে। এই বিরাট পৃথিবীতে তার নিজের বলে কী রইল। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, একপ্রস্তু জমি, বড়সড় চাকুরি কিছুই তো তার নেই। মোটে দু একটি টিউশনি, আর খানিকটা কলমের জোর, বিশ্ববিদ্যালয়ের আনাচে কানাচে বের হওয়া লিটলম্যাগে দু চারটি লেখা, এই তো। কোটিখানেক মানুষের শহরে নিতান্ত এক আবরার হয়ে বেঁচে না থাকতে চাইলে তার প্রয়োজন দু হাতে লেখা। কলমের শক্তিতেই হতে পারে তার নাম যশ খ্যাতি। নয়তো তার গন্তব্য হবে নামগোত্রহীন এক মানুষে, পৃথিবীর এই কিনারের দেশে, অসংখ্য মানুষের ভীরে সে একদিন টুপ করে মরে যাবে। হারিয়ে যাবে অতল বিস্মৃতির আড়ালে।

বাসের একেবারে পেছনের সিটে সে এবার চোখ মুদলো। তার দু চোখে যেন সে দুরকমের স্পন্দন দেখতে পাচ্ছে। একটি দৃশ্যে টিফিনের ব্যাগ হাতে সাধারণ এক কেরানী আবরার। নটা-পাঁচটায় বন্দী এক পুতুলনাচের পাপেট। কোন অদৃশ্য সূত্রধরের সুতোয় ঝুলছে, নড়ছে, ছুটছে... অন্যদৃশ্যে পাঞ্জাবী উন্নরীয় পরিহিত খ্যাতিমান আবরার। বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবরার মাসুদ। পকেটে সোনালী ফাউন্টেন পেন, তেলতেলে মুখে নির্মল হাসি। বড় কোন লোক

সমাগমে বারে বারে লোকে চিনে ফেলছে তাকে। কুশল বিনিময় করছে, অতি উৎসাহী কেউ এগিয়ে দিচ্ছে অটোগ্রাফের খাতা। যশস্বী, নামী ব্যাঙ্গিত্ব আবরার। অন্যচোখের সাদাকালো স্বপ্নটাকে দূরে সরিয়ে সে উঠে দাঁড়াল নানারঙ্গে বর্ণিল স্বপ্নের দিকে। পেছনে পড়ে রইল তার ন্যায়, আদর্শ আর সততা। ক্ষুদ্র এক আবরার যেন দৌড় শুরু করলো আরও ক্ষুদ্র খ্যাতি আর সম্মানের দিকে।

টুপ করে আবরার সাহেবের কপালে ঝারে পড়লো একফোটা ঠাণ্ডা শীতল শিশির। ধোঁয়া ওঠা গরম চায়ের কাপ ডুবে গেছে এক অসম্ভব শীতলতায়। তলানিতে পড়ে থাকা লালচে তরলটুকু কেমন কালচে দেখাচ্ছে। আধাপাকা দুটি পাতা কখন উড়ে এসে পড়েছে বেঞ্চির পাশে। রাত যত গভীর হচ্ছে, শীতের প্রকোপ বাঢ়ছেই। ইমার্জেন্সীর যে সার্বক্ষণিক ব্যস্ততা তারও ভাটা পড়েছে তখন। এখানে ওখানে ছড়িয়ে বসে আছে ডিউটির সিস্টাররা। বোবা একটি টিভিতে জল্প জানোয়ার ছুটছে। আবরার সাহেবে উঠে দাঁড়ালেন দরজার মুখোমুখি জায়গাটা থেকে। হাসপাতালটির পেছনদিকে ছোট ছোট গাছ লাগান হয়েছে। এখানকার মত আলোর অত্যাচার সেখানে নেই। হাসপাতালের কাজকর্ম সকালের আগে শুরু হবে না। তা ছাড়া সেখানে থাকাটা ঠিক স্বস্তিদায়ক নয়। ডিউটির একজন সিস্টার চিনে ফেলেছিল তাকে। সচরাচর যা হয়, অবলীলায় স্যার ডেকে মুখে ফেনা তুলে ফেলে। 'স্যার আপনার তমুক বইটি পড়েছি' 'অমুক চরিত্রিটি আমার প্রিয়' 'একটা অটোগ্রাফ হবে স্যার...একটা সেলফি' সিস্টারটিও এরকম কী যেন একটা বলেছিল। এমনিতে এসব ভালই লাগে, নিজেকে সফল সফল মনে হয়। কিন্তু আজকের এই পরিস্থিতিতে সেসব বিষাক্ত তিতকুটে লেগেছে। সে কি জানে আজকে তার এখানে আসবার কারণ। জানলে হয়তো এরকম স্যার বলে হাসিমুখে কুশল জানতে চাইত না। তারই বা কী দোষ, আবরার সাহেব তো চেয়েছিলেনই এই। একসময় নামী কোন পত্রিকায় লেখা ছাপানোর জন্য কত কী না করেছেন। টিউশনির টাকায় কেনা সস্তা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় রাতজেগে তৈরি হয়েছে গল্প। নিজ হাতে সে লেখা পত্রিকা অফিসে জমা দিয়েছেন। সম্পাদক হাসতেন 'মিয়া আবরার, এইসব ভদ্রসাহিত্য লোক টানবে না। কাটতিও হবে না। গল্প উপন্যাসে কিছু লাল রং লাগাও মিয়া, দেখবা পাবলিক কেমনে থায়।'

হোস্টেলে ফিরে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসেছেন, কী করবেন। নিজের চোখে দেখা অবিচার অনাচার তুলে ধরবার শক্তি তো তার আছে, কলমের মুখে মানুষের ভাষা দেবার সামর্থ্য আছে। ইচ্ছে আছে নিত্যনতুন কায়দাকানুনে পাঠককে চমকে দেবার। কিন্তু রগরগে নীলসাহিত্য, সে অভিজ্ঞতা তো তার নেই। সে গ্রাম থেকে উঠে আসা সহজ সরল যুবক। গ্রাম তার চোখে ধরা পড়েছে বিভুতিভূষনের চোখে, প্রেমে রবীন্দ্রনাথ। ঢাকায় এসে পরিচয় হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের সাথে। কিন্তু সেইসবও কেমন জীবনঘনিষ্ঠ আখ্যান। এইসব পড়ার পর সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে কীভাবে হাঁটা যায় অশুচি দেহজ নিবিড় প্রেমের উপন্যাসের দিকে। কল্যাণী মন তার প্রতিবাদ করে ওঠে, এইসব অন্যায়। তুমি তোমার আদর্শ ন্যায়বোধকে বিসর্জন দিতে পারো না। পারো না সততাকে, মানুষকে বিসর্জন দিয়ে দুটাকার সাহিত্য করতে।

হোস্টেলের ছেঁড়া কাথার তলায় যখন ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকে, ক্যান্টিনে বন্ধুরা যখন দেদারসে ওড়ায় চপ কাটলেট পুরি, ভ্যাকেশনে ট্যুরে যায় তখন আবরারের লোভী মন বিদ্রোহ করে ওঠে। কী হবে এইসব সততা-ফততা দিয়ে। ওসব আদর্শ দিয়ে পেটে ভাত জোটে না খ্যাতি। কপালে জোটে না খ্যাতি। কলমটারে শক্ত করে ধৱ, নিজের শক্তিরে চেন্ একটু।

একবার খ্যাতি পেয়ে গেলে তারপর আর তোকে পায় কে। লাল নীল যে রঙেই বলিস লেখ না কিছু। লোকে তোকে বলবে সাহিত্যিক, তুই জীবনকে ভিন্ন চোখে দেখতে পারিস, তুই জাত শিল্পী। একবার পুরস্কার-টুরস্কার কিছু জুটে গেলে পরে নাহয় বনে গেলি ন্যায়বান, জ্ঞানী, মোটিভেশনাল স্পীকার। ড.জেকিল আর মি.হাইডের মত দিজ সত্ত্বায় তখন বিভক্ত আবরার। হ্যাঁ আর না এর দ্বন্দ্বে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। ন্যায় আর পাপের সংজ্ঞা ঠিক করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলে বারবার। রগরগে নীলসাহিত্য যদি পাপ হয় তবে সে যে কোনোমতে বেঁচেবর্তে আছে, নিরস বিলাসহীন ম্যাটম্যাটে জীবন বয়ে চলেছে সেটা কি খুব পূণ্যেও কাজ। যদি ন্যায়ের কথাই লিখি, সত্য লিখি তবে মানুষ সেসব পড়ে না কেন, জনপ্রিয় হয়না কেন সেসব লেখা। ন্যায়-সত্যকে ব্রাত্য করা যদি পাপ না হয়, তবে যৌনতানির্ভর দেহতাড়িত সাহিত্য কেন পাপ হবে?

অমন দ্বিধা দন্দ আর তর্কর মাঝে কী আছে দেখবার জন্য তুলে আনে সেইসব বই, ম্যাগাজিন। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় তার কাছে নারীর ভূগোল, মানবীর সদ্যআবিস্কৃত দেহসৌর্যে মুঞ্চ আবরার লিখে চলে তারপর। যা থাকে তাই ওগড়ায় মানুষ। হঠাৎ একদিন পেছনের লেখা পড়তে গিয়ে অবাক হয়ে যায় আবরার, নতুন লেখাগুলোতে লাল ছোপ পড়ছে ইদানীং। তার চরিত্রা প্রেমে হচ্ছে আরও নিবিড়, ঘনিষ্ঠ। বাস্তবতার সীমা ছাড়িয়ে একটু কল্পনা করলেই কত দৃশ্য ধরা পড়ে কলমের ডগায়। বন্ধুরা পড়ে পিঠ চাপড়ায়, সম্পাদক উৎসাহ দেন, 'হবে হবে মিয়া আবরার, আপনার হবে।' যৌবনের রং, চড়তে কতক্ষণ লাগে। চরিত্রকে ঝাপ করে দৌলতদিয়া ঘুড়িয়ে আনলেই অনায়াসে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে ফেলা যায়। একটু আটিস্টিক হতে চাইলে চরিত্রা চলে যায় লংড্রাইভে। সঙ্গে বিদেশ ফেরতা সঙ্গিনী। কিংবা অভিজাত পাড়ার রাতের দৃশ্য হলে তো কথাই নেই, মদ জুয়া আর নারীতে তখন বইয়ের পৃষ্ঠাই বলমলে ক্লাব হয়ে ওঠে।

গদ্যে যেমন তেমন, কবিতায় তো কবি স্বাধীন, কয়েকটি 'ঈ-শ' ঘরানার কবিতা লিখতে পারলেই খ্যাতি তুঙ্গে। ঢাকার সাহিত্যমহলে অবুরোধ আসে কবিতা পাঠের, দর্শকসাড়িতে উভেজনায় তরুণেরা শীষ দিয়ে ওঠে। মেটকথা বছর দুয়েকের ভেতর মোটামুটি গোনায় চলে আসে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া আবরার। হয়ে যায় সাহিত্য জগতের প্রমিজিং স্টার। পরম আরাধ্য নাম যশ ততদিনে কিছুটা আসতে শুরুকরেছে পায়ের তলায়। খ্যাতির কাঙাল বেচারা আবরার সেসব বুকে তুলে নেয়। উঠবার পথ চিরকালই বন্ধুর। বুক ঘষে সেই পথ ভাঁতে ভাঁতে দিন চলে যায়। সেই তুলনায় পার্থিব সাফল্য মেলে অল্পই। যা মেলে তা-ও বড় চড়া দামে কেনা। নামবার পথে সেসবের বালাই নেই, ঢালু পথ বেয়ে নেমে যাওয়া যায় অতল গভীরে। মিশে যাওয়া যায় অঙ্ককারে। বিনিময়ে অর্থবিত্ত কিছু হয়তো মেলে, কিন্তু বিবেকের দায় থেকে যায় জীবনভর।

'স্যার, আপনি এখানে?' সেই চিনে ফেলা সিস্টারটির সাথে আবার দেখা হলো।

'কেন কোন সমস্যা?'

'না, এতরাতে আপনি এখানে হাঁটছেন?'

'ভেতরে রোগশোকে দম আটকে আসছিল, তাই এখানে একটু হালকা হতে এসেছি।'

'ও, আপনি কিন্তু আমার পছন্দের লেখক, চাকুরির ফাকে ফাকে সময় পেলেই আপনার লেখা পড়ি। সমাজের একটা ভিন্নরূপ আপনার লেখায় খুঁজে পাই। পুরস্কার পেল যে বইটি সেটি কিন্তু আসলেই একটি ভাল রচনা। কেমন একটা আলাদা ভাষা, মানুষকে একটি বিশেষ চাহিদার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার বিষয়টি আমার কিন্তু বেশ লাগে...'

চাকরির অবসরে এমন একজন জনপ্রিয় লেখককে হাতের কাছে পেয়ে মেয়েটি অনুর্গল কথা বলেই যাচ্ছে, আবরার সাহেব সেসবের সিকিভাগ শুনছেন, বাকি কথাবার্তা কানে পশ্চে না কিছুই। মৃদু গতিতে হাঁটছিলেন, হঠাত থেমে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালেন মেয়েটির, চোখে চোখ রেখে বললেন- “আচ্ছা আপনি তো নারী, এই যে আমার লেখার পুরুষ চরিত্রা নারীর কেবল একটি ঝুঁপই দেখে, দেহজ খুঁটিনাটি তারা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে। এই যে চরিত্রা কেবল নারীকে ভাবে ভোগের উপাদান, এসব কি আপনার ভাল লাগে? এই আমি যে আপনাদের নারীত্বের গৌরব সব পুঞ্জানুপুঞ্জ উল্লেখ করেছি, শিল্পের মোড়কে, সাহিত্যের নামে আপনাদের সব গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করে দিয়েছি। ছড়িয়ে দিয়েছি মানুষের হাতে হাতে, এতে কি আপনি সম্মানবোধ করেন?”

-আমাকে কি খুব ভাল মানুষ বলে মনে হয় আপনার?

২.

মেয়েটি চিন্তা করতে থাকুক। চলুন আমরা একটু আবরার সাহেবের পারিবারিক জীবন থেকে ঘুরে আসি। ধৰুন আপনি হাতির বিলের মগবাজার কোণে দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে আলো বালমলে সড়কদ্বীপের একপাশে সেতুর রেলিং। সেখানে মানুষের জটলা, ফেরিওয়ালার হাকডাক, ভীর। আর অন্যপাশে সাড়ি সাড়ি বিল্ডিংয়ে অগনিত ফ্ল্যাট। ধৰুন এখন সন্ধ্যে সাতটা, একটু খেয়াল করলে দেখবেন আবরার সাহেব চকচকে একটি ঘিয়ে রঞ্জের এক্স করোলায় চেপে আপনাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। তার গন্তব্য সামনেরই কোন একটি বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলার ফ্ল্যাটে। সচরাচর তাকে এই মুহূর্তে ফিরতে দেখা যায় না। আড়ডা ভাংতে ভাংতে নটা সাড়ে নটা বাজে। কিন্তু আজ বাসা থেকে জরুরী ফোনে চলে আসতে হল।

রেবেকার গলাটি ফোনের ওপার থেকেই কেমন ভার ভার লেগেছিল। বাসায় ফিরে দেখা গেল পুরো ফ্ল্যাটটাই ভারী হয়ে আছে। কেমন একটি অন্ধকার ভাব। মেয়ে ফারিয়ার কথা জিগেস করতেই রেবেকা কী একটা ইশারা করে চলে গেল রান্নাঘরে। উদিন্থ আবরার সাহেবে মেয়ের ঘরে গিয়ে দেখেন সেখানে শীতের রাতে আঘাতে-বর্ষন। মেয়ে তার বালিশে মুখ ডুবিয়ে কাঁদছে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই সে দমক আরও বাড়লো। কিংকর্তব্যবিমৃত্ত আবরার সাহেব শোবার ঘরে এসে প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন রেবেকার সামনে, ‘কী হয়েছে?’

জবাবে একটুকরো কাগজ তুলে দিলেন রেবেকা তার হাতে, ‘দেখ।’

চারদিকে রাগ কান্না আর রহস্যের মাঝে কাঁপা কাঁপা হাতে সাদা ভাজ করা কাগজটি খুললেন আবরার সাহেব। সাদা ফুলক্ষেপ কাগজে আরেকটি কাগজ সঁটা। তার নিজেরই কোন বইয়ের ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের অংশটুকু কেটে আঢ়া দিয়ে লাগানো।

শিল্পের পরাকার্ষা দেখাবার জন্য একদা পরম যত্নে এঁকেছিলেন যে দৃশ্য বইয়ের পাতায়, আজ সে চরিত্রের জায়গায় নিজের মেয়েকে কল্পনা করে ঘৃণায় বিষয়ে উঠল তার মন। রাগে ক্ষেভে ফুঁসে উঠতে গিয়েও থেমে গেলেন, এই চিঠির শব্দগুলো তো তারই লেখা। রাস্তার ঐ বদমাশ ছোকড়া হাতে তুলে না দিলে একদিন তো নিজেই তুলে দিতেন এই বই। রাগ তিনি কার সাথে করবেন। নিজের সাথে বোৰাপড়া করতে করতেই মেয়েকে সান্ত্বনা দিলেন, মাথায় হাত রেখে কোন মতে বলতে পারলেন, কাল থেকে আমি তোকে কোচিং থেকে নিয়ে আসব। দেখি তোকে কে কী বলে।

পরের কয়েকদিন আড়ডা থেকে সন্ধ্যার মুখে মুখে উঠে গেলেন আবরার সাহেব। আধো আলো আঁধারিতে সারা শহর যখন গতিময়, তখন বাবা মেয়ে চুপচাপ বাসায় ফেরেন। বছর পনেরো মেয়ে তার গুটিসুটি মেরে লুকিয়ে যেতে

চায় গাড়ির কাচের আড়ালে। বুকে ছানা গোজা মুরগীর মত আবরার সাহেব ইতিউতি চান, কত জায়গায় কত রকম ছেলে-পিলের আড়া। তার মাঝে সেই পড়ুয়া বদমাশকে পাবেন কোথায়।

সপ্তাখানেক পরের এক শীতসন্ধ্যার কথা। প্রতিদিনকার মত আজও দুজন ফিরছেন কোচিং হতে। পুরো সাতটি দিন নিরূপদ্রবে কাটিয়ে ফারিয়া ততদিনে খানিকটা স্বাভাবিক হয়েছে। টুকটুক করে কথা বলছে দুজন, ক্লাসের কথা, বন্ধুদের কথা। কতদিন ধরে এই ছেলেটি ঘুরঘুর করছে সে আলাপও একবার তুলতে চাইলেন আবরার সাহেব। হঠাত ফারিয়া জিজ্ঞেস করে বসলো, 'বাবা, তুমি এইসব লিখেছিলে কেন?' মেয়ের দ্বিধাহীন নিষ্পলক চাহনীর সামনে বাকহারা হয়ে গেলেন আবরার সাহেব। কী জবাব দেবেন এই প্রশ্নের! আপাতত পরিস্থিতি সামাল দেয়ার সুযোগ নিলেন সামনে এক ফার্স্টফুডের দোকান মিলে যাওয়াতে, 'তুই বোস, আমি তিনটা বার্গার নিয়ে এখনই ফিরছি।' মিনিট পনেরোর মামলা। ফিরে এসে দেখেন গাড়ীর সিটে ঠকঠকিয়ে কাঁপছে ফারিয়া। হাতে সেদিনকার মতোই একটুকরো সাদা কাগজ। রীতিমত হতভম্ব হয়ে গেলেন আবরার সাহেব। এসি বন্ধ ছিল বলে জানলা খুলেছিল ফারিয়া, কালো হেলমেট চাপান ঘণ্টামতোন এক ছেলে এসে গুজে দিয়েছে কাগজ, সেইসঙ্গে হৃষ্কী, বাড়াবাড়ি করার ফল ভাল হবে না!

জমে ওঠা আঁধারের মতো এক দূর্ভেদ্য দেয়াল যেন উঠে গেল দুই প্রজন্মের দুটি মানুষের মাঝে। সেই রাত্রি আর পরের কয়েকটি দিন নিরব নিশ্চুপ হয়ে রাহিলেন আবরার সাহেব। এক অদৃশ্য বুমেরাং যেন ফিরে ফিরে আসছে তার দিকে বারবার। এবারকার আঘাত যেন আরো মোক্ষম, জোরালো। লাল কালিতে লেখা হৃষ্কিটি যতবার নজরে পড়ছে ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইছেন যেন। একবার ভাবেন, বদমাশ যত ক্ষমতাশালীই হোক না কেন পুলিশকে জানাবেন সব। নিরাপত্তা তো সবার আগে। পরক্ষণেই চোখে ভেসে ওঠে পত্রিকার ক্রমবর্ধমান খুন-ধর্ষনের লম্বা তালিকা। শতশত অপরিচিত বিচারহীন ধর্ষিতার তালিকায় যখন নিজের মেয়ের নামটাও দেখতে পান তখন সেই উদ্যম কেমন নেই হয়ে যায়। মনে হয় যেন অদৃশ্য এক শেকলে বন্দী তিনি। যে শেকল দেয়ালে দেয়ালে বন্দীত্বের ধ্বনি তোলে শুধু, মুক্তির বার্তা দেয় না।

বারন্দায় ঝুলতে থাকা সন্ধ্যা মালতীর ডগায় লাল-হলুদ ফুল ফোটে, জ্বলন্ত সিগারেটের রোঁয়া ঘুরে ঘুরে উঠতে কেমন ধাঁধা লাগিয়ে দেয় আবরার সাহেবের চোখে। রোলিং চেয়ারে বসে তিনি তাকিয়ে থাকেন নিঃসীম অন্ধকারে। একসময় বোধ আর চেতনার পর্দা ছাপিয়ে তিনি যেন চলে যান ভিন্ন এক জগতে। যে জগতে সবকিছুই দোদুল্যমান। বারান্দা, ফনীমানসার চারা, ফুলের গাছ, রেলিং সবকিছু দুলছে...দুলছে...

পাশের ঘর থেকে বিকট এক আর্তনাদ ভেসে এল হঠাত। দোদুল্যমান অনিশ্চয়তার জগত থেকে একধাক্কায় বেরিয়ে এসে মুখোমুখি হলেন চরম বাস্তবতার। ফারিয়ার ঘর থেকে আসছে চিত্কার। রেবেকা ছুটছে পানির বালতি হাতে। আবরার সাহেব হাতা গোটাতে গোটাতে এগিয়ে গেলেন মেয়ের ঘরের দিকে।

ফারিয়ার বিছানার চারদিকে আগুন জ্বলছে। ছেঁড়া বইয়ের পাতায় লাগিয়ে দেওয়া আগুনের মাঝে উপুড় হয়ে শয়ে আছে ফারিয়া। আবরার সাহেব আধপোড়া দুয়োকটি বইয়ের মলাট হাতে নিলেন, সেসব বই তারই লেখা।

৩.

চলুন হাসপাতালের সেই শীতের রাত্রে ফিরে যাওয়া যাক। আবরার সাহেব সিস্টারটিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে রেখে ফিরে চললেন কেবিনের দিকে। ডিউটির ডাক্তারটি চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাকে দেখে সমবেদনায়

খানিকটা বিমর্শ হয়ে উঠলেন, 'আসলে আপনার মেয়ের চোখটি আমরা বাঁচাতে পারলাম না স্যার, স্যার। আরও কত কিছুই তো হতে পারত। সেসব থেকে বেঁচে গেছেন বলে হালকা হোন স্যার। আমরা তো সর্বোচ্চ চেষ্টাই করলাম। বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা।' আবরার সাহেব শুকনো একটি ধন্যবাদ জানিয়ে চললেন কেবিনের দিকে।

এক বেডের কেবিন, পাশে তিনটি চেয়ার। কাঠের দরজা খুলে এখন ঘরে চুকবেন আবরার সাহেব। এই শীতের রাতে এতটা সময় বাইরে থাকায় উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাবেন রেবেকা। কিন্তু সেটি গোনায় না ধরে তিনি এগিয়ে যাবেন আরেকটি চেয়ারের দিকে। ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করবেন কলম, কাগজ খুঁজবেন এবার। কিন্তু এটা হাসপাতাল, এক টুকরো সাদা স্বচ্ছ কাগজ খুঁজে পাওয়া এতই সহজ! ডান পকেটে দেখলেন, নেই। বাম পকেটে মনে হলো আছে, সেখানে হাত ঢেকানোর পর মনে হল ডান পকেটেই তো রেখেছিলেন একটুকরো কাগজ...

সমাপ্ত

০৭/০২/১৯

ঢাকা

কবিতা চাপলা

ক্যাম্পাস লিটারেচুর
বর্ষ ১ | অংখ্যা ৬ | অক্টোবর ২০২০

ভাবনার গোড়ায় পচন ধরা

আজফার মুস্তাফিজ



শিকলে বাধা মস্তিষ্ক যেন জঞ্জালের বুড়িগঙ্গা,

ভাবনার গোড়ায় পচন ধরা

দুর্গন্ধময় সারা শরীর।

বাঁচতে হলে বদল প্রয়োজন!

মস্তিষ্কের প্রতিটা স্নায়ুর মধ্যে

যে নর্দমার আবর্জনা জমেছে।

পরিচ্ছন্ন অভিযান অতি জরুরী,

তা না হলে প্রতিটা মস্তিষ্ক ধর্ষক

সমাজ নিজেও কুলাঙ্গার ধর্ষক।

ছিন্নভিন্ন দেহ পড়ে থাকে,

ডাস্টবিনের কুকুর দুর্গন্ধে মরে।

সূর্যের আলো পাখার তলে লুকায় কাকে,

নারী আড়ালে তাই পৃথিবী আঁধারে ঢাকে।

ତାରା

ବୁଦ୍ଧ

ରାଖେ

ନି

ସୃଜିତ ସିଙ୍କ

ଆଜି ମହିରଙ୍ଗରା ଜେଗେ ଉଠେଛେ,
ରାତ୍ରିବର୍ଣ୍ଣ ତାଂଦେର ଚୋଖ,
ରାକ୍ଷସ ଏର ନ୍ୟାୟ ଭୟକ୍ରିୟା ଦାଁତ ।
ମୁଖ ଦିଯେ ହିଂସା ଗୋଙ୍ଗାନିର ଶବ୍ଦ ।
ଯେନ ସବ କିଛି ଗିଲେ ଖେତେ,
ଉଠେ ଏମେହେ ।
କୋଟି ବହୁରେର ସୁମ ଭେଙେ ।
ନିମେଷେଇ ତହନତ୍ତ କରେ ଦିଚ୍ଛେ ବହୁତଳ ସବ ଭବନ ।
ତାଂଦେର ଭୟେ ଏଲୋପାଥାଡ଼ି ଦୌଡ଼ାଚେଷ୍ଟ ମାନୁଷ,
ଆମିଓ ଦୌଡ଼ାଚ୍ଛି । ଗନ୍ତୁବ୍ୟହିନୀ ପଥେ । ତାଂଦେର ସାଥେ ।

କଂକିଟେର ଏଇ ରାସ୍ତାତେ ବେଶ କରେକବାର,
ହୋଇଟୁ ଖୋଲାମ, ରକ୍ତ ଝାଡ଼ିଲୋ ।
ଖେଳାଳ କରିନି, ବ୍ୟାଥାଓ ଅନୁଭବ କରିନି ।
ସବାରମତୋ ଆମିଓ ଦୌଡ଼ାତେ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ।

ଆଜି ହୟତୋ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବ୍ୟାନ୍ତତା,
ଥାକତୋ ନା ।
ରକ୍ତ ଝାଡ଼ତୋ ନା, ଦୌଡ଼ାତେଓ ହତୋ ନା ।
ଏଁଦେର ତୋ, ଆରୋ କରେକ କୋଟି ବହୁ,
ସୁମିଯେ ଥାକାର କଥା ଛିଲ ।
ଶୀତଳ ହାଓଯାତେ ଶହର ମାତିଯେ ରାଖାର କଥା ଛିଲ,
ମନ ଜୁଡେ କାନ୍ଦନିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ୍,
ଏକେ ଦେଓଯାର କଥା ଛିଲ ।
ଅର୍ଥଚ ଶହରେର ଶୈଶ ଗାଛଟି ଯେଦିନ କାଟା ହଲୋ,
ସେଦିନୋ ତାଂଦେର ଆରୋ କୋଟି ବହୁରେର,
ସୁମାନୋର ବନ୍ଦୋବନ୍ଦ କରା ହେୟଛିଲ ।

କିନ୍ତୁ, ତାରା କଥା ରାଖେ ନି ।

ଠେମାକେ ଏକଟା ଗଲ୍ଲ ଶୋନାତେ ଚାହିଁ ଜାରିନ ତାସନିମ ତଥାପି

ତୋମାକେ ଏକଟା ଗଲ୍ଲ ଶୋନାତେ ଚାହିଁ
ସେଇ ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ମେଯେର ଗଲ୍ଲ
ଯାକେ ନତୁନ ଜୀବନ ଶୁରୁ ଆଗେଇ ହତ୍ୟା କରା
ହେଲିଲ ।
ଆର କିଛୁ ନରପଣ୍ଡ ବଲେଛିଲ ଏଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା
ତୁମି କି ଶୁନବେ ଆମାର ଗଲ୍ଲ?

ନାକି ଶୁନତେ ଚାଓ ସେଇ ଗଲ୍ଲ,
ଯେ ଗଲ୍ଲେ ଚାର ବହରେର ଶିଶୁ ଧର୍ଷିତ ହୟ ତାର ବାବାର
କାହେ ।

କୀ ଅପରାଧ ଛିଲ ସେଇ ଶିଶୁଟିର?
ନାକି ତାର ଜନ୍ମଟାଇ ବଡ଼ ଅପରାଧ?
ତୁମି କି ଶୁନବେ ଆମାର ଗଲ୍ଲ?

ନାକି ଶୁନତେ ଚାଓ ସେଇ ଗଲ୍ଲ,
ଯେ ଗଲ୍ଲେ ମେଯେର ହାତେ ବାବା-ମାର ମୃତ୍ୟୁ ହୟ ।
ସୁଶିଳା ନା ଦେଓୟା କି ଛିଲନା ତାଦେର ଅପରାଧ?
ବିଲାସିତା କି ମାନୁସକେ ଖାରାପ ପଥେ ନେଯନା?
ତୁମି କି ଶୁନବେ ଆମାର ଗଲ୍ଲ?

ନାକି ଶୁନତେ ଚାଓ ସେଇ ଗଲ୍ଲ,
ଯେ ଗଲ୍ଲେ ଆଇ.ସି.ଇ.ଟୁ ଏର ଅଭାବେ ବାବାର କୋଳେ
ମେଯେର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ।

ମାନବିକତା ନାକି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା କୋନଟା ଦାୟି?

ନାକି ଦାୟି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନାମକ ବନ୍ଦଟି?
ତୁମି କି ଶୁନବେ ଆମାର ଗଲ୍ଲ?

ନାକି ଶୁନତେ ଚାଓ ସେଇ ଗଲ୍ଲ,
ଯେ ଗଲ୍ଲେ କରୋନା ସନ୍ଦେହେ ମାକେ ଛେଲେ ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ି
କରେ ।

ସମ୍ପର୍କେର ବନ୍ଧନ କି ଏତୋଇ ଠୁନକୋ?
ନାକି ଅସୁନ୍ଧ ମା ଫେଲନା?
ତୁମି କି ଶୁନବେ ଆମାର ଗଲ୍ଲ?

ନାକି ଶୁନତେ ଚାଓ ସେଇ ଗଲ୍ଲ,
ଯେ ଗଲ୍ଲେ ନ୍ୟାୟ-ଅନ୍ୟାୟେର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନୁସ ବୋବେନା ।
ନାକି ଦୂର୍ଲଭିତର ଦେଯାଲ ହୟ ରାଜନୀତି?
ନାକି ମାନୁସେର ଚୋଖେ ପରାନୋ ହୟ ଠୁଲି?

ଏରକମ ଅନେକ ଗଲ୍ଲେର ସାକ୍ଷୀ ଆମରା
ତୁମି କି ଶୁନବେ ଆମାର ଗଲ୍ଲ?

ତୋମାକେ ଶୁନତେଇ ହରେ
ଯାତେ ତୁମି ବୁଝାତେ ପାରୋ
ପୃଥିବୀଟା ଠିକ ଗତିତେ ଚଲାନ୍ତେ
ଏଇ ପୃଥିବୀର ମାନୁସେର ଚଲାର ପଥ ଜଟିଲ ।

ভীতি

তরিকুল ইসলাম

নবীন দৌড়াচ্ছে

পালাচ্ছে

কেউ তেড়ে আসছে

তার দিয়ে

মে ছুটছে

প্রাপনে ছুটছে

আয়ুরেখা ধরে

অচেনা ভীড়ে।

নবীন স্থির হতেই

ঠার আগ্রা দৌড়াচ্ছে

ভীতি দিশাহীন

পালাচ্ছে

প্রাপনে পালাচ্ছে

ঠিকামাহীন

অজ্ঞান!

যুবের মধ্যে

স্বপ্নে

দুঃস্বপ্নে

নবীন দৌড়াচ্ছে

পালাচ্ছে

প্রাপনে!

দৌড়ে

পালিয়ে

হাঁসাতে হাঁসাতে

তেড়ে প্রক্ষে

স্বপ্ন ডেডে

নবীন

আগ্রকে উঠে

শুণুর সামনে

বাঁধা পড়েছে?



নারী নয়, ঈশ্বর ধর্মিত হয়

রাজিব খান

কয়েক পৃষ্ঠা কাগজ দুঃখ নিয়ে বলছি
প্রতিদিন পথেঘাটে আমার নামেই
ডাকাডাকি হটগোল পসরা সাঁজে;
এক দেহ ভিন্ন নাম, ভিন্ন দাম, ভিন্ন হাতে।
লিখতে জানি না আমি, আমি জড় পদার্থ
তাই অযোগ্য লেখক আমার বুকে লেখে।
তাঁদের একই কথা বারবার;
“মানি না কো মানবো না, খুনি-ধর্ষক ছাড়বো না।”

তুমি রাষ্ট্র নায়ক মুচকি হাসো,
চুলে গোফে তেল মেখে উচ্চস্বরে বলো, ধূর ব্যাটা!
কত দেখলাম লাশ, লাশ, মিছিল, ধর্ষণ।
মুখে মুখে লোক কাছে ছিলাম আমি কঠোর ভীষণ,
তাই স্ফুলিঙ্গের মতো আমার ভাষণ,
“রক্তে কেনা বাংলায়, আর কোন খুন, ধর্ষণ নয়।”

বিপ্লবীরা আস্ত গাধা অল্পতেই যায় যে গলে
খুঁজে দেখো চারিপাশে হরতাল, মিছিল ভাষণ শেষে,
সংগ্রামের অবসানে বিজয়ীর বেশে আঁড়ালে তে
তোমাদের রাষ্ট্র নীতি ধর্ষকের পায় তেল ঢলে।

নিজ গায়ে দাগ কেঁটা আজ অধিকার নাই,
যদি সত্য ডাক আসে, যদি কলম হাতে সাহস যোগায়-
কলমের তীক্ষ্ণতায় শরীরে আঁচড় কেঁটে লিখে দিবো,
“ধর্মিতারা নারী নয়, স্বয়ং ঈশ্বর ধর্মিত হয়।”

বিচার

আয়মান আনসারী অন্তরা

মায়ের স্বপ্ন পূরণ করবে বলেথ
ক্লাসে প্রত্যেকবার ফাস্ট হওয়া মেয়েটি
নাচে গানে হৈ হঞ্জোড়,
যার তাল কেউ ধরতে পায়না,
সেই মেয়েটি এখন আর ক্লাসে যায়না।

সে আর গান গায়না, পাখির সাথে কথা কয়না,
প্রভাতের মিষ্ঠি রোদ তাকে আর কাছে টানেনা

চথঙ্গলা মেয়েটির আজ নেই স্বপ্ন ভঙ্গার ভয়,
মনের স্বপ্ন হয়ে গেছে আজ বিষয়তায় ক্ষয়।
সারাক্ষণ শুধু আঁধারেই পড়ে রয়।

কি ছিলো তার দোষ?
আগে সে তো ফিরতো বাসায়,
সন্ধ্যার আগেই রোজ।

সেদিন একটু রাত হয়েছিলো বলেই,
কেন হতে হলো কয়েকজন নরপিশাচের ভোজ।
পরের দিন দেখা যায় তাকে নিকটের রাস্তায়,
মৃত দেহখানি পড়ে আছে বিধ্বস্ত অবস্থায়।

বলো সমাজ কি দোষ ছিল মেয়েটার?

ইত্তিজিং এর প্রতিবাদে সাহসী হাত খানি শুধু তুলেছিল
একবার।

ও হ্যা, দোষটি ছিলো তাই,
ছেলেটি ছিলো কোনো এক বড়লোকের ভাই।

পত্রিকাতে ছবি ছাপায়,
আন্দোলন হয় খানিকক্ষণ,
মেয়ের কথা ভেবে মায়ের
জলে ভরে যায় দুনয়ন।
বিচার হবে হবে বলে সবাই
সান্ত্বনা দেয় মন।

বছরের পর বছর গেল,
ফেলানী, তনু, হিরার মতো
কতোই জীবন চলে গেলো,
কই বিচার তো হলো না কারো।

মিজের বোন কলিজা,
মাল অন্যের বোন,
কই ধর্ষিতার খাতায় নেইতো
কোনো বড়লোকের বোন।

আর কতদিন চুপ রবো?
তাহলে কি ধরেই নেব থ
সাধারণ মেয়েরাই দুর্ভোগ সবো?

আশায় আছি বসে আজও,
কবে সঠিক বিচার পাব।

স্বত্ত্বাংকী, মেয়েলারের পুরুষোত্তম চিরকিশোর

পরিযায়ী মেঘের ফ্যাসিবাদী শিসে আমাদের খতিয়ান জুড়ে জমির আলপথ নিয়ে
চিরায়ত দন্ডে ভাগ হয়ে গেছি আমরা অনেক আগেই। আমাদের গোষ্ঠীর ইতিহাস
এখন বাড়িতে বাড়িতে আগুন আর নিষ্পাপ ফসলের মুখচ্ছবি রঙাঙ্ক হওয়ার রৌরবিক গল্পে মুখর।

ফলত দেওয়ানী-ফৌজদারি মামলা আমাদের করেছে সর্বস্বান্ত। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে
তাই বেছে নিয়েছি সেক্যুলারিজম। পাঠক, আপনি জানেন, পিঠ বাঁচুক না বাঁচুক
এছাড়া মধ্যস্থত্বভোগের আর কোনো বৈধ বা অবৈধ উপায় আমার ছিল না।

তবু প্রায়শই বিবেকের ক'গাছি দড়ি হেঁমিকায় অবর্তীর্ণ হয় সে। ওইসব বদলিকারক
রায়ের মতো দণ্ডকর্ত্ত্বে আমার মৃত্যুদণ্ডের রূমাল ছেড়ে দেয়। নিজের ঘাড় মটকানোর
শব্দে ভাতসুম কিংবা কামসুমের রাজনৈতিক আলাপ ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বসি।
নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করি—এই শব্দের উৎস নিশ্চয়ই আমার গোবেচারা বউয়ের আঙুল।

তারপর আর কি—! বর্ণি, ঠগী আর ঠকবাজের সাথে একত্রে বাজারে গিয়ে
তরিতরকারির মতো বুদ্ধিজীবীর নতুন কাঠেরচশমা কিনি। তার সাথে হাজারবার
কচলানো লেবু কচলে সেক্যুলার পান করিট আসে আমার দিকে। পাঁক খেয়েখেয়ে
অলীকস্পন্দের ফাঁসিমধ্যে বিচারপতির ভূ
। কারণ আমি সেক্যুলার। প্রগতিশীল।
আমি গাছের খাই; তলারও কুড়াই।

সামাজিক

ব্যাপ্তিস্ম লিটোরেচার
বর্ষ ১ | সংখ্যা ৬ | অক্টোবর ২০২০